ধূলিগন্ধা

মহাবিদ্যালয় সাহিত্য-পত্রিকা

মার্চ, ২০২০

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

বলাগড়, হুগলী

Dhuligandha

College Magazine

Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya

Balagarh, Hooghly

March, 2020

সভাপতি –

ড. প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ

আহ্বায়ক ও সম্পাদক –

অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সোমা বিশ্বাস, ড. সুস্মিতা দাস

সদস্য –

অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সোমা বিশ্বাস, ড. সুস্মিতা দাস

ছাত্র প্রতিনিধি –

সীমা বৈরাগী(বাংলা), শৌভিক লাহা (ইংরাজী), দেবদীপা মণ্ডল(ইংরাজী)

প্রচ্ছদ : সন্তু কর্মকার

প্রকাশক : ড. প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

মুদ্রণ : মৃত্তিকা প্রকাশনী

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০২০

‘ধূলিগন্ধা’র জন্মলগ্নে দেওয়া বিজয়কৃষ্ণ মোদকের শুভেচ্ছা-বাণী

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় হল হুগলী জেলার পিছিয়ে পড়া, দরিদ্রতম মানুষ অধ্যুষিত একটি অঞ্চলের আশার আলো, সেখানকার শ্রমজীবী মানুষদের বুকের মধ্যে লালন করা দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষার মূর্তরূপ। সেই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম সাহিত্য সংকলন প্রকাশের আনন্দময় মুহূর্তে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকলন প্রকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান - বিজ্ঞানের চর্চা একটি নতুনতর মাত্রা পায়। নানান দ্বিধা ও সংকোচ অনেক অনেক সময়ে শিক্ষার্থীর মানসলোকে এক অকারণ জড়তার সৃষ্টি করে থাকে। নতুন ঐ মাত্রায় ধীরে ধীরে উক্ত জড়তা অপসৃত হয়ে সচেতনতার দৃঢ়তা লাভ করে।

আর শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ায় যদি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিজ পরিবেশ, নিজ সমাজ, নিজ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা বিকশিত হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে তার সার্থকতা কোথায়? কারণ যে শিক্ষা শুধু শিক্ষিত করে তোলে, সচেতন করে না, তা মানুষকে পশ্চাদমুখ করে দেয়। কিন্তু সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ তো চেয়েছে সম্মুখে এগিয়ে যেতে।

সেই এগিয়ে চলার সাথী হোক ‘ধূলিগন্ধা’, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য সংকলন।

তাং- ৪ মে, ১৯৯৩

বিজয় মোদক

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সভাপতি

পরিচালন সমিতি

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

বিপ্লবী বিজয়কৃষ্ণ মোদক

প্রতিষ্ঠাতা, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

আবির্ভাব : ২৭ জুন, ১৯০৬

তিরোধান : ৯ মে, ১৯৯৪

“শুভায় ভবতু”

আমাদের দু'জন প্রিয় মাস্টারমশাই – শ্রী মানিক বিশ্বাস (স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ) এবং শ্রী রাজু দত্ত (স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ) ২০২১-এর জুলাই মাসে এই মহাবিদ্যালয় ছেড়ে অন্য কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন উজ্জ্বল এবং গৌরবময় হোক – আমরা এই শুভকামনা জানাই।

আরেকদিকে – ২০২১-এর এপ্রিল মাসে – দীর্ঘ কর্মজীবন পার করে অবসর নিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষাকর্মী শ্রীমতী তপতী দাস এবং ২০২২-এর জানুয়ারী মাসে অবসর নিলেন আরেক প্রাণবন্ত মাস্টারমশাই শ্রী মৃণাল কান্তি রায় (স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, বাণিজ্য বিভাগ)। তাঁদের অবসর জীবন হোক নীরোগ, প্রশান্ত ও আনন্দময়।

মহাবিদ্যালয় আপনাদের ভোলেনি... ভুলবে না...।

অধ্যক্ষের কলমে

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা 'ধূলিগন্ধা' প্রকাশিত হল। পঠন- পাঠন - পাঠক্রমের ঘেরাটোপের বাইরেও যে আদিগন্ত বিস্তৃত পরিসর আছে, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায় শিল্প-সাহিত্য। এই পরিসর আত্মপ্রকাশের - আত্মবিকাশের - আত্ম আবিষ্কারের। 'ধূলিগন্ধা' তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে দিয়ে এই কাজে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উৎসাহিত করে এসেছে। আশা রাখি, ভবিষ্যতেও তার পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল হবে নিত্য নব সম্ভারে।

পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় যাঁরা প্রবন্ধ/গল্প/কবিতা লিখলেন, তাঁদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একটি দীপ থেকে দীপাবলির সৃষ্টি হয়। তাঁদের লেখাগুলিও আরো অনেক লেখার উৎস হয়ে উঠুক।

'ধূলিগন্ধা'র সুরভিত ভুবনে সকলকে স্বাগত।

ড. প্রতাপ ব্যানার্জী

অধ্যক্ষ

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

সূ চী প ত্র

সম্পাদকীয় ১১

প্রবন্ধ

Durga Puja and Our Economic Health - Pratap Banerjee ১৩

সাবিত্রীবাঈ ফুলে : ইতিহাসে উপেক্ষিতা - ডালিয়া হোসেন ১৫

Creativity and the Brain - Dr. Abhijit Ghosh ২৩

Decoding the “Monstrous Feminine” in Greek and Roman Mythology - Soma Biswas ২৫

অর্থনীতি এবং দর্শনের মধ্যে আন্তঃসংযোগ: একটি সিম্বিওটিক সম্পর্ক - কালাচাঁদ সাঁই ২৯

কেন পড়ব সংস্কৃত....? - ড. দেবলীনা ঘোষ ৩২

মঙ্গলাচরণ - প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ ৩৪

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা - তানিয়া দে ৩৬

কালিয়াগড় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের ইতিহাস সমগ্র - আরতি হেমব্রম ৩৮

নাচ ও একটি সাধারণ মেয়ে - নিতিশা মন্ডল ৪০

গল্প

তখন মাধবিলতায় ফুল ফুটছিল - পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৪২

'অদ্ভুত যাত্রী গাড়ি!' - অমিত দে ৪৬

কবিতা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় - বলাকা হালদার ৫৩

নিষ্ঠুর নিয়তি - সীমা বৈরাগী ৫৪

মনে রবে? - প্রিয়াঙ্কা সরকার ৫৫

সম্পাদকীয়

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া /বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।"

অন্তর্গত ভাবের বহিঃপ্রকাশ লেখনীতে, আর তা ঝরে পড়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। যা ছিল এতদিন আমার মনে সীমাবদ্ধ - কলমের ধারায় তা সকলের হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়ে আজ যারা মহাবিদ্যালয়ের আঙিনায় কুঁড়ি, তাদের আত্মগত ভাবকে প্রস্ফুটিত করাই 'ধূলিগন্ধা'র প্রয়াস। তাই 'ধূলিগন্ধা' যেমন শিক্ষকের পরিণত কলমে প্রাণ পায়, তেমনই ছাত্রদের লেখনীতে প্রাণ পায় তাদের অনুভূতি।

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা 'ধূলিগন্ধা' শিক্ষক-ছাত্রের মেলবন্ধনের প্রয়াস। এই প্রয়াস সার্থক হোক। আর যাঁরা প্রাণ খুলে সাহায্য করলেন, তাঁদের জন্য সম্পাদকদের তরফ থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা।

শুভেচ্ছা সহ

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সোমা বিশ্বাস, ড. সুস্মিতা দাস

আহ্বায়ক

পত্রিকা সমিতি

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

Durga Puja and Our Economic Health

Pratap Banerjee, Principal

The Durga puja is the greatest festival in not only in West Bengal but also in all over India. Devi Durga is worshiped as the goddess of Shakti (Power) to win over all demons (evils). The Durga Mata gives joy, love and peace to us. The Durga puja festivities continue for a period of five days. Actually, it begins on Mahalaya and after five days the inauguration of the puja takes place on Mahasashti. The other days of the puja are Mahasaptami, Mahaastami, Mahanabami and Dashami. This long celebration of Durga puja has a huge impact on the economy of West Bengal and somewhat on the Indian economy. Each puja committee prepares the budget at least two/three months before puja according to their aim and capacity. The funds are collected from various diversified sources: Subscription and Donation from members and local peoples, sponsorship of companies, advertisements in the souvenir etc. In the present situation, the big budget for puja is generally fixed up more than 1 Crore, the expenditure of medium-budget puja is in the band from 20 lacs to 1 Crore and low-budget puja estimates their incomes & expenditure upto 5 lacs. If we consider the least number of puja, 500 in each category in all over Bengal, we can estimate the total investment is not less than approximate 500 crore by the total puja committees during the festival period. The budgeted amount is generally spent on the account of Pandel and its decoration, Idol of Devi Durga and her children, Lighting, Sound system, puja & priest, safety and security, fees payable to local authority/Govt. agencies for providing service, inauguration ceremony and cultural programme, publication of souvenir and hand-bill, emersion and others unallocated heads. The money circulates from top to bottom which implies that money flows from affluent society to the hands of the workers under unorganized sector. The Durga Mata comes as a blessing to these poverty-stricken people of Bengal. Potters get money, low-skilled construction workers/ carpenters/ laborers get money, electricians get money, Drummers (Dhakis) get money, more specifically different service-providers enjoy all- seasoned-best money. Those who performs the cultural programme such as cinema artists, singers, musicians, Band-parties, Dance-groups they also enjoy stop-gap money. Moreover, Printers and publishers also become economically benefitted by publishing souvenir and various story books. The money also comes as a blessing to the grocery shops as the public consumed more in such auspicious occasion and they sell various items relating to the puja to the puja committee. The banking transaction

becomes high on account of the Durga puja. This festival opens a big chance to the trader to make their businesses at all time high in any fiscal year. It is the customs that the devotees of the goddess Durga use new dresses during the period of puja. On this occasion, the people buy more than one set of dress for themselves. The people also buy shoes, bed-sheet/bed covers, utensils, accessories, cosmetics, jewellery etc. The shop-owners offer discount on different consumer durables to attract the public. The most of the shops remain opens for long time well before puja, even on Sundays and holidays. The hawkers also earn handsome profits. The restaurants and street food stalls also make high profits. The businesses of travel agencies and tour-operators also become high in such time as many busy persons like doctors, lawyers and teachers choose this time for travelling to the other states/countries. All waits for these sunny days. The Government of West Bengal, The railway, Post and Telegraphs etc also declares puja bonus for a section of their work-force.

The total economic impact can be categorized as follows:

* Creation of short-term employment

* Increase in labour supply

* Increase in standard of living

* Increased awareness of the region as a travel/tourism destination

* Increased investment and commercial activity in the region

* Price increases during event.

So, we can conclude that the goddess Durga not only brings pleasure and happiness among us, it also riches us financially.

সাবিত্রীবাঈ ফুলে : ইতিহাসে উপেক্ষিতা

ডালিয়া হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

গোটা বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় তা সব সময় রচিত হয় নির্বাচিত মানুষের নির্বাচিত ঘটনার ইতিহাস হিসেবে; আর সেই নির্বাচনের অনেকটাই করেন ইতিহাসবিদরা নিজেদের চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে। ভারত এর ব্যতিক্রম নয়। মূলধারার ইতিহাস রচিত হয়েছে রাজাদের কাহিনি নিয়ে, শাসকের কাহিনিগুলোকে কেন্দ্র করে। শাসিত সেখানে প্রান্তিক, ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে গ্রাহ্য নয়। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রান্তিক মানুষের অধিকাংশই সমাজে নিম্ন জাতিভুক্ত বা জনজাতির মানুষ। দেখা যায়, ব্যতিক্রম বাদে ইতিহাস পুরুষের ইতিহাস, নারীর নয়।মেয়েরা ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্রাত্য। সাবিত্রীবাঈ একাধারে ছিলেন নিচু শুদ্র জাতিভুক্ত এবং নারী। ফলে তার অবস্থান ছিল প্রান্তিকের মধ্যে প্রান্তিকতর।

সাবিত্রীবাঈ ফুলে ছিলেন একজন শিক্ষিকা, কবি, সমাজ সংস্কারক ও ভারতের নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম শিক্ষিকা এবং শিক্ষাবিদ । অথচ তাঁর কথা খুব কম লোকই জানেন। ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ তাঁর পাওয়া যায় না। কেন এই উপেক্ষা? তা কি শুধু এই কারণেই যে তিনি পিতৃতান্ত্রিক এবং বর্ণ বৈষম্যযুক্ত সমাজের অধীনে ছিলেন? অথবা, তিনি তাঁর স্বামী বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক জ্যোতি রাও ফুলের খ্যাতির আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিলেন? তাঁর সম্পর্কে মারাঠি ভাষায় কিছু কিছু রচনা পাওয়া গেলেও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় কোনো লেখা পাওয়া যায় না।

সাবিত্রীবাই ফুলে ১৮৩১ সালের ৩ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মালি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং লক্ষ্মী ও খান্দোজি নেভাসে পাতিলের কনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। বাপের বাড়িতে তাঁকে কোনো লেখাপড়া শেখানো হয়নি। একে নিচু জাত, তার উপর আবার মেয়ে। সেখানে পড়াশোনা শেখানো বা না শেখানো কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় ছিল না। সমাজের বাধা ছিল। সুতরাং, অন্যান্য মেয়ের মতোই সাবিত্রী থাকল নিরক্ষর। স্বাভাবিকভাবেই সে অধিকাংশ সময়েই বাড়িতে থেকে তাঁর মাকে ঘরে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতো। রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করা, এই সব ধরনের কাজ তাকে সারা দিন করতে হতো। এছাড়াও তাঁর বাবার মাঠের কাজেও তাকে সাহায্য

করতে হতো। অর্থাৎ পরিবারের সব ধরনের কাজই তাকে ঘুরে ফিরে করতে হতো যেমনটা ছিল সেই সময়ে, সেই সমাজের রীতি। একদিন সাবিত্রী একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল। তাঁর বাবা তা দেখে খুব অসন্তুষ্ট হন, আর বইটা নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সাবিত্রী কিছু বলে না, তবে চুপিসারে বইটা তুলে নিয়ে আসে আর নিজের কাছে রেখে দেয়। সেদিন সে জানতো না তাঁর লেখাপড়া শেখার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

নয় বছর বয়সে, তিনি ১৩ বছর বয়সী জ্যোতিরাও ফুলেকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর জীবন একটা প্রচলিত ধাঁচে বয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না। অল্প দিনেই দেখা যায় তার জীবন বিপরীত এক গতিতে প্রবাহিত হতে লাগল। এক অজানা পথ, যে পথে সেই সময়ে কোন মেয়ে হাঁটতো না। শুরু হলো জ্যোতি রাওয়ের হাত ধরে যথার্থ এক নতুন জীবন একেবারে আলাদা, ব্যতিক্রমী। তিনি এবং সগুনাবাই ক্ষীরসাগর, জ্যোতিরাওয়ের চাচাতো বোন, জ্যোতিরাও-এর বাড়িতেই শিক্ষিত হয়েছিলেন। স্কুল শেষ করার পর, সাবিত্রীবাঈ দুটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে ভর্তি হন। যার মধ্যে প্রথমটি ছিল আহমেদনগরের একটি প্রতিষ্ঠানে যা সিনথিয়া ফারার নামে একজন আমেরিকান ধর্মপ্রচারক দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল পুনের একটি নরমাল স্কুলে। সাবিত্রীবাই হলেন সম্ভবত প্রথম ভারতীয় মহিলা শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষিকা যিনি শিক্ষকতা করার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

জ্যোতিরাওকে নিজেকেও অনেক লড়াই করেই লেখাপড়া করতে হয়েছিল। তিনি প্রথমে যে স্কুলে পড়াশোনা করতেন সেই স্কুলটা তাকে ব্রাহ্মণদের বিরোধিতায় ছেড়ে দিতে হয়। নিচু জাতির লোক আর মেয়েদের লেখাপড়া করা করা উঁচু জাতদের একদমই বরদাস্ত ছিল না। জ্যোতি রাও-এর লেখাপড়ার সুযোগ অন্যভাবে এসে যায় এবং সেখানে তিনি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। সে সময়ের পরিবেশে সরকারি স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখা সম্ভব হতো শুধুমাত্র উঁচু জাতের ছেলেদের। একমাত্র অল্প কিছু মিশনারি স্কুল ছিল যেগুলিতে সবার পঠন-পাঠনের সুযোগ ছিল। নিচু জাতের ছেলেরা যেখানে পড়তে পারতো এইরকম একটা স্কুলে জ্যোতি গেল।

এহেন জ্যোতি রাও ছিলেন শুধু সাবিত্রীর স্বামী নন, তার প্রথম শিক্ষাগুরু তাঁর প্রথম পথ প্রদর্শক। জ্যোতিরাও নিজে স্ত্রীশিক্ষায় বিশ্বাস করতেন। তিনি নিজে মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। তবে সেই কাজে তাঁর সহায়তার জন্য কিছু মানুষের এগিয়ে আসা দরকার ছিল। কিন্তু সেই সময়ে কাজের জন্য কাকেই বা পাবেন। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ভয়ে কেউ সেই ভাবে সাহায্যের হাত বাড়াতে চায় না। সবাই ভয়ে থাকে, কী না কী হয়ে যায়। জ্যোতি রাও তখন তার নিজের স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর কাজ শুরু করেন। তিনি মনে করেন তাঁর স্ত্রী লেখাপড়া শিখলে তাঁর ও যেমন শেখা হল তেমনই তিনি জ্যোতি রাওকে তাঁর

লক্ষ্যে এগোতে সাহায্য করতে পারবেন। অন্তত একজনকে তো পাশে পাওয়া যাবে। শুরু হল এক ব্যতিক্রমী দাম্পত্য সম্পর্ক।

প্রথমদিকে জ্যোতিরাও কিছুদিন সাবিত্রীকে নিজেই পড়ালেন। তবে সে কাজটা তাকে অতি গোপনে করতে হতো। কারণ বাড়ির লোকের তাতে মত ছিল না। তাঁদের ভয় ছিল বর্ণহিন্দুরা নিচু জাতির লোকেদের এই লেখাপড়ার চর্চার খবর জানতে পারলে তাদের উপর আক্রমণ-অত্যাচার নামিয়ে আনবে। সেই ভয়ে তাঁরা জ্যোতি রাওয়ের এই বিদ্যাচর্চার বিরোধিতা করেন। জ্যোতিরাও কিন্তু পিছপা হন না। সাবিত্রীকে পড়ানোর রাস্তা খুঁজে বার করেন। সেটা হল এই রকম – যখন জ্যোতিরাও মাঠে কাজ করতেন আর সাবিত্রী দুপুরে তাঁর খাবার নিয়ে যেতেন তখন সবার অলক্ষ্যে জ্যোতিরাও তাঁকে পড়াতেন। প্রতিদিনের এই অল্প সময়ই তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এমন ভাবেই সাবিত্রীর পঠন পাঠন চলতে থাকে। তবে এই গোপনীয়তা বেশিদিন বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই জ্যোতি রাওয়ের বাবা জানতে পেরে যান। আর তখন জ্যোতিরাওকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার হুমকি দেন। তবু জ্যোতিরাও তাঁর স্ত্রীর লেখাপড়া বন্ধ করতে রাজি হন না। রাজি হন না স্ত্রী শিক্ষা বা নিচু জাতিদের শিক্ষা প্রসঙ্গে নিজের মত পরিবর্তন করতে।

চাপ বাড়তেই থাকে। ব্রাহ্মণরা জ্যোতিরাওয়ের বাবার উপর চাপ বাড়াতেই থাকে। তাঁরা ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তাঁর ছেলে বিপথে যাচ্ছে, পাপের পথে পা বাড়িয়েছে। এই চাপ ক্রমে ভয়ের কারণ দাঁড়িয়ে যায়। একসময় পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো হয়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত জ্যোতির বাবা তার ছেলেকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। চাপের মুখে পড়ে জ্যোতি আর সাবিত্রী তখন অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হল। সেদিন সাবিত্রীর সামনে দুটো পথ খোলা ছিল। এক, সামাজিক রীতিনীতি মেনে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থেকে যাওয়া। দুই নিয়ম-নীতি ভেঙে তার স্বামীর সঙ্গ দেওয়া। সাবিত্রী অনায়াসে দ্বিতীয় পথটি বেছে নেন। সেদিন সাবিত্রী তাঁর স্বামীর পাশেই দাঁড়ান। ফলে সাবিত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয় না, তা চলতে থাকে। আর তারই পাশাপাশি তাদের সমাজ-সংস্কারের সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন লালিত হতে থাকে। জ্যোতিরাও সাবিত্রীকে যেমন নিজেই পড়াচ্ছিলেন তেমনভাবেই পড়াতে থাকেন। ওঁরা যখন বাস্তুচ্যুত হন তখন জ্যোতির বয়স বাইশ বছর সাবিত্রীর আঠারো।

বাবার বাড়ি ছেড়ে ফুলেরা সেদিন আশ্রয় নেয় জ্যোতি রাওয়ের এক বন্ধু উসমান শেখ এর বাড়িতে। সেখানে সাবিত্রীর পরিচয় হয় উসমানের বোন ফতিমা বেগম শেখের সঙ্গে। ক্রমে তাদের দুজনের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। ফতিমা লিখতে পড়তে জানতেন। তাঁর চিন্তাভাবনা প্রগতিশীল ছিল। দেখতে দেখতে সাবিত্রী আর ফতিমার মধ্যে এক গভীর সখ্য ও সহযোগিতার বন্ধনের সূচনা হয়। এমন এক বন্ধন যা দীর্ঘস্থায়ী হয় আর দুজনকে আগামী দিনে সহযোদ্ধা হিসাবে

প্রতিষ্ঠিত করে। আগেই বলা হয়েছে, সাবিত্রীবাঈ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সাবিত্রী প্রশিক্ষণ লাভের পর ১৯৪৮ এ জ্যোতি রাও পুণরায় বিশ্রামবাগ ওয়াদায়, তত্তসাহ ভিদে নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়ির মালিক জ্যোতিরাও ফুলের কর্মকাণ্ড দেখে আকৃষ্ট হয়ে তার বাড়িতে স্কুল স্থাপনের অনুমতি দেন। এই স্কুল স্থাপন করলে ফুলেরা খোলাখুলি ভাবেই ব্রাহ্মণ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে। শিক্ষার উপর ব্রাহ্মণ আর পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার প্রশ্নের মুখে পড়ে।

ফতিমা বেগম শেখ সাবিত্রীবাইকে আজীবন সঙ্গ দিয়েছেন সহযোদ্ধা হিসেবে এ কথা যেমন পরম সত্য, তেমনি এখানে আর একজন মহীয়সী মহিলার কথা উল্লেখ না করা অবিচার হবে। তিনি হলেন শগুনাবাই। তিনি জ্যোতি রায়ের পালিকা মা। তিনি ছিলেন বাল বিধবা। এক ব্রিটিশ আধিকারিকের ছেলের দেখাশোনার কাজ করতেন। ফলে ইংরেজি বুঝতে পারতেন আর তাতে কথা বলতেও পারতেন। শিশুকালে জ্যোতির মা মারা যাবার পর তিনি জ্যোতির তদারকি করেন। জ্যোতির ইংরেজি শিক্ষায় হাতে খড়ি তাঁর তত্ত্বাবধানেই হয়। জ্যোতির মিশনারি স্কুলে যাওয়ার কথাকে তিনি সমর্থন করেন আর সেই থেকেই জ্যোতির জীবনে বড় পরিবর্তন আসে। তাঁর মিশনারি শিক্ষা তাকে সহজে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে দেয়। গণতন্ত্রের ধারণা, ফরাসি বিপ্লবের কথা, মানুষের অধিকারের কথার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। এই শগুনা বাঈ ফুলেদের স্কুল পরিচালনায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

সাবিত্রীবাঈ ও জ্যোতিরাওয়ের কোনো সন্তান জন্ম নেয়নি। ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তান যশবন্ত রাওকে তাঁরা দত্তক নিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। সেই সময় সমাজে বিধবারা খুব নির্যাতিতা হতেন। অনেক পুরুষরাই তাদের অসহায়তার সুযোগ নিতেন। এই পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পরিবারের সদস্য অথবা পাড়া প্রতিবেশী। গরিব এবং নিচু ঘরের বিধবাদের অবস্থা ছিল আরো করুণ। এমনই এক নির্যাতিতা বিধবা ছিলেন কাশীবাঈ। তিনি তার এক পড়শি চতুর শাস্ত্রীর দ্বারা অত্যাচারিত হন এবং অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েন। কিন্তু চতুর শাস্ত্রী সেই সন্তানকে অস্বীকার করেন। এই অবস্থায় নিরুপায় বোধ করে কাশীবাঈ তার সন্তানকে গলা কেটে হত্যা করেন। এই ঘটনাটি ঘটে ১৮৬৩ তে। বিচারে বিচারক কাশীবাঈ-এর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করেন। তাঁকে আন্দামানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় । তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা অপরাধী যাঁর এত কঠিন শাস্তি হয়েছিল। এ ঘটনায় জ্যোতিরাও আর সাবিত্রীবাঈ দুজনেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের অতি সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেই পুণেতে নিজেদের বাড়িতেই এইসব বিপন্ন বিধবাদের জন্য একটি আশ্রম চালু করলেন। সেটি বিধবা মেয়েদের জন্য এমন একটি আশ্রয় কেন্দ্র ছিল যেখানে অন্তঃসত্তা বিধবা মেয়েরা নিরাপদে থাকতে পারবেন, তাদের সন্তান প্রসব করতে পারবেন এবং সেই সন্তানকে

কারো দত্তক নেওয়ার জন্য রেখে যেতে পারবেন। উল্লেখযোগ্য, সেই সময় নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি অত্যন্ত সাহসী ও প্রগতিশীল পদক্ষেপ। এর ফলে একদিকে যেমন অনেক ক্ষেত্রে বিধবা মেয়েদের প্রাণহানি ঠেকানো সম্ভব হয়, অন্যদিকে শিশু হত্যাও ঠেকানো যায়।১৮৭৪ এ এক এমনই এক নির্যাতিতা তাদের কাছে আসেন। তার নামও ছিল কাশীবাঈ। এঁর ছেলেটিকে তাঁরা দত্তক নেন এবং নাম রাখেন যশবন্তরাও। যশবন্তরাও যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন, তখন বিধবার সন্তান হওয়ায় কেউ তাকে পাত্রী দেবে না। ফলস্বরূপ, সাবিত্রীবাঈ তার সংস্থার একজন কর্মীর সাথে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এটি একটি আন্তঃবর্ণ বিবাহ ছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, সাবিত্রীবাঈ এবং জ্যোতিরাও ফুলের সাফল্য রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির ধারক স্থানীয় সম্প্রদায়ের অনেকেরই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। কান্দুকুরি বলেছেন যে, সাবিত্রীবাঈ প্রায়শই একটি অতিরিক্ত শাড়ি নিয়ে তার স্কুলে যাতায়াত করতেন কারণ তিনি তাঁর রক্ষণশীল বিরোধীদের দ্বারা পাথর, গোবর এবং মৌখিক গালাগালির দ্বারা আক্রান্ত হতেন। ১৮৫০-এর দশকে, সাবিত্রীবাঈ এবং জ্যোতিরাও ফুলে দুটি শিক্ষামূলক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের নাম ছিল— নেটিভ মেল স্কুল, পুনে, এবং সোসাইটি ফর প্রমোটিং দ্য এডুকেশন অফ মাহার, মাঙ্গস, ইত্যাদি। এই দুটি ট্রাস্ট অনেকগুলি স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সাবিত্রীবাঈ ফুলে এবং পরে ফাতিমা শেখের নেতৃত্বে ছিল। ১৮৫৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর খ্রিস্টান মিশনারী সাময়িক পত্রিকা Dayandaya কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরাও সাবিত্রীবাঈ এবং তাঁর কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, বলেছেন,

এটা আমার মনে হয়েছে যে মায়ের কারণে একটি শিশুর মধ্যে যে উন্নতি ঘটে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো। তাই যারা এদেশের সুখ ও কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের অবশ্যই নারীদের অবস্থার দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং দেশকে এগিয়ে নিতে চাইলে তাদের জ্ঞান দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এই চিন্তা থেকেই আমি প্রথমে মেয়েদের স্কুল শুরু করি। কিন্তু আমার বর্ণের ভাইয়েরা পছন্দ করেনি যে আমি মেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছি এবং আমার নিজের বাবা আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। কেউ স্কুলের জন্য জায়গা দিতে প্রস্তুত ছিল না বা আমাদের কাছে এটি তৈরির জন্য টাকা ছিল না। লোকেরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ইচ্ছুক ছিল না কিন্তু লাহুজি রাঘ রাউত মাং এবং রণবা মাহার তাদের বর্ণের ভাইদের শিক্ষিত হওয়ার সুবিধা সম্পর্কে বোঝাতেন।

সাবিত্রীবাঈ ফুলে তাঁর স্বামীর সঙ্গে একত্রে বিভিন্ন বর্ণের ছেলেমেয়েদের পড়াতেন এবং এর জন্য তাঁরা মোট ১৮ টি বিদ্যালায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৮৯৭-এ বিশ্বব্যাপী বুবোনিক প্লেগের তৃতীয় অতিমারী দেখা দেয়। সাবিত্রীবাঈ এবং তার দত্তক পুত্র যশবন্ত, ১৮৯৭ সালে নালাসোপাড়ার আশেপাশের এলাকায় বুবোনিক প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য একটি ক্লিনিক খোলেন। ক্লিনিকটি পুনের উপকণ্ঠে, সংক্রমণ মুক্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পান্ডুরং বাবাজি গায়কোয়াড়ের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে সাবিত্রীবাঈ বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুবরণ করেন। বাবাজি গায়কোয়াড়ের ছেলে মুগ্ধওয়ার বাইরে মাহার বস্তিতে প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে জানতে পেরে, সাবিত্রীবাঈ ফুলে তার পাশে ছুটে আসেন এবং তাকে তাঁর পিঠে করে হাসপাতালে নিয়ে যান । এই প্রক্রিয়ায়, সাবিত্রীবাঈ ফুলে প্লেগ আক্রান্ত হন এবং ১৮৯৭ সালের ১০ মার্চ রাত ৯:০০ টায় মারা যান ।

সাবিত্রী প্রচলিত অর্থে নারীবাদী ছিলেন না কারণ, তখন নারীবাদ কথাটির সঙ্গেই কেউ পরিচিত ছিল না। তার পরে, নারীবাদের নামে যে চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে তার মূল উপাদানগুলি সাবিত্রীর চিন্তায় খুঁজে পাওয়া যায়। সেই অর্থে, সাবিত্রী নারীবাদী। তিনি পুরুষশাসিত সমাজের সমালোচনা করেন, তার বেড়াজাল ভাঙ্গার জন্য লড়াই করেন, মানুষকে সেই কাজে এগিয়ে আসতে বলেন, মেয়েদের সামাজিক বাধা নিষেধ ভাঙার জন্য আহ্বান জানান, নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি তোলেন। সাম্প্রতিক সময়ে নারীবাদী আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সাবিত্রীর ও তার আন্দোলনের নারীবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের একাধিক প্রচেষ্টা। উঠে আসে দলিত নারী হিসাবে তার পরিচয় ও বিশেষ সমস্যার দিকগুলি। দেখা যায় মূল ধারার নারীবাদী বিশ্লেষকরা তাকে নারী পরিচয় দেখেন। দলিত ঐতিহাসিকরা তাকে তার 'পত্নী' ও 'মাতৃ' পরিচয়ে দেখেন। শেষোক্তরা দেখান কীভাবে সাবিত্রী তার স্বামীর পাশে থেকে সমস্ত সময়ে জ্যোতির সমস্ত আপদে বিপদে আদর্শ পত্নীর ভূমিকা পালন করেন এবং বিপন্ন প্রান্তিক সমাজের মানুষকে পুত্র স্নেহে শুশ্রূষা করেন। দলিত নারীবাদীরা এই দুটি দৃষ্টিকোণেরই সমালোচনা করেন। তাঁরা গুরুত্ব দেন সাবিত্রীর স্বাধীন সত্তার উপর। যে সাবিত্রী কবি, লেখিকা, শিক্ষিকা, সমাজ সংস্কারক তার উপর। যে সাবিত্রীর জ্যোতি রাওয়ের স্ত্রীর বাইরে একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। দলিত নারীবাদীরা পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণবাদী সমাজের চাপে ইতিহাসের উপস্থাপনায় হারিয়ে যাওয়া সাবিত্রীর সেই সত্তাকে পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হন।

আগেই বলা হয়েছে, উপনিবেশিক শাসনের আমলে ভারতের ইতিহাস রচিত হয়েছে বিদেশী ঐতিহাসিকদের দ্বারা। এবং এই ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে উচ্চ বর্ণের মানুষের কর্মকাণ্ড, সমাজে তাদের অবদান, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ইত্যাদি । ব্রিটিশরা প্রান্তিক এবং দলিত মানুষদের সংগ্রামের কোন নথিপত্র বা ইতিহাস সংরক্ষিত করেনি। পরবর্তীকালে যখন দেশীয় ঐতিহাসিকরা ইতিহাস লিখতে শুরু করেন তারা বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। ঐতিহাসিকরা তাদের গবেষণার মধ্য দিয়ে অনেক অজানা তথ্য এবং অজানা ইতিহাস উদ্ধার

করেছেন। তা সত্ত্বেও দলিত ও প্রান্তিক মানুষের ইতিহাস উপেক্ষিত থেকে গেছে। ভারতের এই ইতিহাস চর্চা শুরু করেন ড. রণজিত গুহ। পরবর্তীকালে, অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জী, গায়ত্রী স্পিভাক প্রমুখরা একে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবুও যেন কোথাও ফাঁক থেকে গেছে। এখানে প্রফেসর পার্থ চ্যাটার্জীর একটি বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে।

"One of the key problems we encountered in our original project was that it was very hard to come by transcripts or texts of subaltern views, opinions, testimony. These were rare because the

standard historical archive simply did not have such records. So one of the things that we tried out-and Guha was one of the best exemplars of this — was to take standard, official historical accounts - those left by government officials, landlords, elite groups, etc. and to read them against the grain. That is, to actually discover a hidden transcript which we could read as the subaltern speaking. This was of course a reading technique, and the essay you referred to "The Prose of Counter Insurgency" – is a very fine example of how this was done. [প্রফেসর পার্থ চ্যাটার্জি একটি সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্যটি করেছিলেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন Richard McGrail, PhD Student, Anthropology, Stanford University]

সুতরাং উপসংহারে বলা যেতে পারে সাবিত্রীবাঈ ফুলে ইতিহাসে উপেক্ষিতা হয়েছেন তার কারণ, তিনি শুধু নিম্ন বর্ণের মানুষ ছিলেন সেই কারণেই নয়, একইসঙ্গে তিনি ছিলেন একজন নারী। দলিত ইতিহাস নিয়ে যখন চর্চা শুরু হয়েছে তখনো সমাজ কিন্তু এতটা অগ্রসর হয়নি যে কোন নারীর কর্মপ্রয়াসের স্বাধীন চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ হবে। সুতরাং তিনি জ্যোতি রাও এর স্ত্রীর ভূমিকাতেই আবদ্ধ থেকেছেন। তাঁর স্বাধীন কর্মপ্রয়াসের বিবরণ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। এখন যখন দলিত ইতিহাস রচনায় গায়ত্রী স্পিভাকের মতো লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে, তখন সাবিত্রীবাঈ ফুলের মত আরো অনেক অজানা নারীর কর্মকাণ্ডের ইতিহাস রচিত হবে, এটাই ভবিষ্যতের আশা।

তথ্যসূত্র:

1. চ্যাটার্জী, দেবী (২০২১), সাবিত্রীবাঈ ফুলে - জীবন ও মনন, প্রকাশকঃ পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ, কলকাতা, জেলা কমিটি,

2. Chakravarti, Uma. (1994), Reconceptualising Gender : Phule, Brahminism and Brahminical Patriarchy, Nehru Memorial Museam and Library.

3. Rege, Sharmila (2009). Savitribai Phule Second Memorial Lecture (2009). National Council of Educational Research and Training. ISBN 978-8-17450-931-4.

4. Sundararaman, T. (2009). Savitribai Phule first memorial lecture, [2008]. National Council of Educational Research and Training. ISBN 978-81-7450-949-9. OCLC 693108733.

5. G.P. Deshpande (ed. 2010), Selected writings of Jyotirao Phule, Leftword, Delhi .

Creativity and the Brain

Dr. Abhijit Ghosh
Assistant Professor, Department of English

How does great literature happen? What is the source of artistic creativity? Is it inspiration or conscious and disciplined effort, is it genius or skill, that produces immortal literary works. This is one of the great debates in the history of English literature especially between the formidable Neoclassicists and the illustrious Romantics. The 18th century stalwart Alexander Pope quipped "True ease in writing comes from art, not chance, As those move easiest who have learn'd to dance." In the Romantic revolution at the onset of the nineteenth century, William Wordsworth refuted the emphasis on "art" with the celebrated definition of poetry as "the spontaneous overflow of powerful feelings," and Samuel Taylor Coleridge claimed that imagination was a divine gift available to a select few. Coleridge claimed to have composed entire poems in dreams, and there are quite a few poets who have consciously used dream images to communicate emotions that are beyond rational understanding. Some novelists and story writers too have revealed that dreams were the source of their ideas. Many artists have relied on the hidden realm of the unconscious for creative ideas; and, psychological criticism would have us believe that even conscious choice of images and expressions are related to unconscious processes of the mind.The power and source of creativity has remained a mystery.

Maybe divine imagination and human reason, the unconscious realm of dream and the conscious arena of knowledge and craft are not polar opposites after all, maybe creativity is a complex process that combines both. When Robert Frost says, "Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words," it reveals a conscious or unconscious process behind the origin of a poem. Creativity may be understood as a process happening in the brain. In recent times the diverse branches of study included under the cognitive sciences are seeking to understand the brain. Cognition is the mental process of acquiring knowledge and understanding through the information received by the five senses and from experience and thought. The cognitive sciences are examining creativity under the rubric of 'creative cognition' that involves inspecting mental structures and processes to explore how creative ideas are generated.

Present research rules out any difference between the structures and processes that underlie ordinary thinking and creative thinking, the workings of an ordinary mind and a 'creative' mind. The difference, according to creative cognition, lies in the breadth and the diversity of

knowledge, and the capacity or intensity of memory to use that knowledge. This finding reminds us of Wordsworth's famous characterisation of a poet, where he says that a poet is, "a man, it is true, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature, and a more comprehensive soul, than are supposed to be common among mankind." Creative cognition also reveals that the ability to associate distant, even disparate ideas or objects, signals creative power. Creative people are able to focus their attention on a broader scope of things. Quite ironically therefore, Samuel Johnson's disparaging criticism of metaphysicals for producing poetry where "The most heterogeneous ideas are yoked by violence together," appears to be a fitting appraisal of the metaphysical creative genius.

Although Cognitive sciences are developing crucial insights into the brain, we must understand that it considers the materiality of the brain as primary, it treats the brain as an intelligent machine. The mind, psychology and subjectivity have become largely secondary concerns, or derivative and drawing upon the brain. This appears to be a stumbling block if we tend to perceive artistic creativity as special and different from scientific or other forms of creativity or innovative thinking. On the whole, therefore, creative power remains an enigma. The concepts generated by creative cognition are still quite inadequate and the human brain remains a dark and mysterious terrain.

Decoding the “Monstrous Feminine” in Greek and Roman Mythology

Soma Biswas
Assistant Professor, Department of English

“Men have committed the greatest crime against women (…) They have led them to hate women, to be their own enemies.”

— Hélène Cixous, The Laugh of the Medusa

In the rich tapestry of Greek and Roman mythology, a significant number of the most iconic monsters are coded as female. From the venomous Gorgon Medusa to the half-woman, half-sea monster Scylla, these terrifying creatures reveal much about the patriarchal societies that created them. The portrayal of women as monstrous often stems from a fear of female power, sexuality, and the perceived threat they pose to the established social order. These monsters, according to Debbie Felton“all spoke to men’s fear of women’s destructive potential. The myths then, to a certain extent, fulfil a male fantasy of conquering and controlling the female.”

Women have always been placed within the moral compass of society and have been assigned roles which they have to perform within the societal norms.Most of these grotesque and the abhorrent mythological tales of women monsters represented a cautionary tale of what could happen to women if they lost their moral compass and expressed their “femininity”.

Medusa: The Gorgon's Curse

Perhaps the most famous female monster in Western literature is Medusa, one of the three Gorgon sisters. In the original myth, Medusa was a beautiful maiden who was transformed into a hideous creature by the goddess Athena after being raped by Poseidon in her temple. Medusa's hair turned into venomous snakes, and her gaze could turn any living creature into stone. Medusa’s monstrosity is unwillingly thrust upon her, and the gods leave her to deal with the consequences.

The myth of Medusa has been interpreted as a cautionary tale about the dangers of female sexuality. Her transformation from a beautiful woman to a monstrous creature reflects the idea that female power and desire are inherently threatening to patriarchal society. Medusa's ability to turn men to stone with her gaze has been seen as a metaphor for the fear of female sexuality and the need to control it.Helene Cixous, the French feminist in her essay “The Laugh of the Medusa” says“You only have to look at the

Medusa straight on to see her. And she's not deadly. She's beautiful and she's laughing."

Lamia, the child slayer

In Greek mythology, Lamia had an affair with Zeus, and as a punishment Hera either killed her children or made Lamia kill them (traditions vary) – an act that transformed her into a monstrous child murderer., Lamia's "monstrous" qualities are constructed around her gender. Her ability to slay children is a reversal of the mother-figure that produces life.The untameable sexuality associated with the female is damning for them and those around them. She is a fallen woman, devouring men and incapable of "motherhood", the greatest role that is assigned to a woman and her incapability is the final castration that society imposes on her.

Scylla and Charybdis: Monstrous Femininity

Another iconic female monster in Greek mythology is Scylla, a multi-headed, dog-like creature who resided in a cave, preying on sailors who passed by. In Homer's *Odyssey*, Odysseus must choose between facing Scylla or the whirlpool monster Charybdis, both of which are described as unambiguously female.

The portrayal of Scylla and Charybdis reflects the idea that female power and desire are inherently destructive and chaotic. Scylla's monstrous form, with her multiple heads and dog-like features, represents the fear of female sexuality and the need to control it.

The Sphinx: Riddles and Ruin

The Sphinx, a winged monster with the head of a woman and the body of a lion, is another example of a female monster in Greek mythology. In the myth, the Sphinx terrorised the city of Thebes by posing a riddle to all who passed by. Those who failed to answer correctly were devoured by the monster.

Her monstrous form, with the head of a woman and the body of a lion, represents the fear of female power and the need to control it. The Sphinx's ability to devour those who fail to solve her riddle reflects the idea that female desire and power are inherently destructive and chaotic.

Echidna: The Mother of Monsters

In Greek mythology, Echidna was a half-woman, half-snake creature who was known as the "mother of all monsters." She was the mate of the monstrous Typhon and gave birth to many of the most terrifying creatures in Greek mythology, including the Hydra, Cerberus, and the Chimera.

Echidna's portrayal as the mother of monsters reflects the idea that female power and desire are inherently threatening to patriarchal society. Her ability to give birth to monstrous offspring represents the fear of female sexuality and the need to control it. The myth of Echidna also reflects the idea that female power and desire are inherently destructive and chaotic.

Even the mermaids, the image of a beautiful woman with the lower body of a fish who could cause floods, and would sometimes lure sailors to their doom with their enchanting songs is a classic example of male power being subjugated by femininity and so . The sight of a mermaid on a voyage was a sign of bad luck.

Sirens, like mermaids, used songs to lure sailors to their deaths, and were also female/animal hybrids. Sirens were giant bird creatures with the head of a woman.

The three furies were goddesses of vengeance. They could inflict madness and disease upon their victims. In the Underworld, they were responsible for the torture of wicked souls.

The portrayal of women as monsters in Greek and Roman mythology reflects the patriarchal societies that created them. These misogynistic renditions of femininity only reflect society's fear of the threat of women's assertion of femininity and often their identities. These myths often stem from a fear of female power, sexuality, and the perceived threat they pose to the established social order. However, in recent years, these female monsters have been reclaimed by feminist scholars and writers as symbols of female empowerment and resistance to patriarchal oppression. By embracing the monstrous qualities of these female figures, we can challenge the idea that female power and desire are inherently threatening or destructive. The dehumanisation of women as monsters or their elevation as goddesses only undermine how women have often been deprived of their basic identity as humans equal to men and each of these designations only carried with them their own burdens imposed on women.

Reference Books:

Barbara Creed, *The Monstrous-Feminine Film, Feminism, Psychoanalysis*(Routledge, 1993).

Debbie Felton, "Rejecting and embracing the monstrous in Ancient Greece and Rome," in A.S. Mittman and P.J. Dendle (eds.), *The Ashgate Research Companion to Monsters and the Monstrous* (Routledge, London, 2016).

Helene Cixous, The Laugh of the Medusa. *Signs: Journal of Women in Culture and Society,* (Brighton,1981).

Jess Zimmerman, *Women and Other Monsters: Building a New Mythology* (Beacon Press, Boston, MA, 2021).

অর্থনীতি এবং দর্শনের মধ্যে আন্তঃসংযোগ: একটি সিম্বিওটিক সম্পর্ক

কালাচাঁদ সাঁই

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ

"সিমবায়োটিক"বলতে দুই বা ততোধিক সত্তার মধ্যে পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ককে বোঝায়, যেমন জীব, মানুষ বা সিস্টেম। তারা যোগাযোগ করে, একে অপরের উপর নির্ভর করে এবং সম্পর্ক থেকে উপকৃত হয়, প্রায়শই বৃদ্ধি, উন্নতি এবং বর্ধিত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। এই সুরেলা সংযোগ জড়িত সকলের জন্য একটি সহায়ক এবং সমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরি করে।

"সিমবায়োটিক" বলতে দুই বা ততোধিক সত্তার মধ্যে পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ককে বোঝায়, যেমন জীব, মানুষ বা সিস্টেম। তারা যোগাযোগ করে, একে অপরের উপর নির্ভর করে এবং সম্পর্ক থেকে উপকৃত হয়, প্রায়শই বৃদ্ধি, উন্নতি এবং বর্ধিত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। এই সুরেলা সংযোগ জড়িত সকলের জন্য একটি সহায়ক এবং সমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরি করে।

অর্থনীতি এবং দর্শন দুটি স্বতন্ত্র শাখা, বলে মনে করা হয়। যাইহোক, ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করার পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে তারা গভীরভাবে আন্তঃসংযুক্ত। অর্থনীতি, যা পণ্য এবং পরিষেবাগুলির উৎপাদন, বিতরণ এবং ব্যবহার অধ্যয়ন করে, প্রায়শই কী মূল্যবান হওয়া উচিত, কীভাবে সংস্থানগুলি বরাদ্দ করা উচিত এবং কী একটি ন্যায্য সমাজ গঠন করা উচিত সে সম্পর্কে নৈতিক প্রশ্নগুলির সাথে জড়িত। অন্যদিকে দর্শন, অস্তিত্ব, নীতিশাস্ত্র এবং জ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক সত্য বুঝতে চায়। অর্থনীতি এবং দর্শনের অধ্যয়ন একসাথে মানব আচরণ, সামাজিক কাঠামো এবং অন্তর্নিহিত নৈতিক ও নৈতিক নীতিগুলির আরও সামগ্রিক বোঝার জন্য অনুমতি দেয় যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি :

এর মূলে, অর্থনীতি দার্শনিক নীতির ভিত্তির উপর নির্মিত। অর্থনীতিবিদরা যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চান—যেমন কী মানুষের আচরণকে চালিত করে, কী যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কীভাবে সম্পদ বরাদ্দ করা উচিত—সেগুলি সহজাত ভাবে দার্শনিক। উদাহরণ স্বরূপ, ইউটিলিটির ধারণা, অর্থনীতির একটি মৌলিক ধারণা, সুখ এবং মঙ্গলের দার্শনিক ধারণার মধ্যে নিহিত। উপযোগিতাবাদ, জেরেমি বেন্থাম এবং জন স্টুয়ার্ট মিল দ্বারা বিকশিত একটি দার্শনিক

তত্ত্ব, বিশ্বাস করে যে সর্বোত্তম কর্ম হল সেইটি যা সামগ্রিক সুখকে সর্বাধিক করে তোলে। এই ধারণাটি ইউটিলিটি সর্বাধিকীকরণের অর্থনৈতিক তত্ত্বকে সরাসরি প্রভাবিত করে, যা পরামর্শ দেয় যে ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি সর্বাধিক করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।

তদুপরি, অর্থনীতিতে ন্যায়বিচারের ধারণাটি গভীরভাবে দার্শনিক। জন রলস এবং অমর্ত্য সেনের মতো দার্শনিকরা সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার ধারণা আবিষ্কার করেছেন। ন্যায্যতা হিসাবে রলসের ন্যায়বিচারের তত্ত্ব, উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে কল্যাণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে। "অজ্ঞতার আবরণ" সম্পর্কে তার ধারণা, যেখানে ব্যক্তিরা সমাজে তাদের অবস্থান না জেনেই সিদ্ধান্ত নেয়, সম্পদের আরও সুষম বন্টনকে উৎসাহিত করে— এমন একটি ধারণা যা কর, সামাজিক কল্যাণ এবং আয়ের বৈষম্য নিয়ে আলোচনাকে আকার দিয়েছে।

অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা :

অর্থনীতি শুধু সংখ্যা এবং মডেলের অধ্যয়ন নয়; এটি মানুষের আচরণেরও একটি অধ্যয়ন, এবং মানুষের আচরণ সহজাতভাবে নৈতিক। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রায়ই নৈতিক প্রভাব আছে যে বাণিজ্য বন্ধ জড়িত উদাহরণস্বরূপ, কর, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতিগুলি নৈতিক বিবেচনার সাথে জড়িত। সরকারের কি পরিবেশগত টেকসইতার চেয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত? বৈষম্য কমাতে সম্পদের পুনঃবন্টন করা উচিত, এমনকি যদি এর অর্থ ধনীদের ওপর আরো বেশি কর আরোপ করা হয়? এগুলি শুধু অর্থনৈতিক প্রশ্ন নয়, নৈতিক প্রশ্নও।

দর্শন এই নৈতিক দ্বিধাগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে। নৈতিক তত্ত্ব যেমন ডিওন্টোলজি, পরিণতিবাদ, এবং গুণ নীতিশাস্ত্র অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের নৈতিকতা মূল্যায়নের জন্য কাঠামো প্রদান করে। ডিওন্টোলজি, যা নৈতিক নিয়মের আনুগত্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এমন নীতির বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে পারে যেগুলি ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘন করে, এমনকি যদি সেগুলি বৃহত্তর সামগ্রিক উপযোগিতায় পরিণত হয়। অন্যদিকে, ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি নীতির নৈতিকতা মূল্যায়ন করবে ফলাফলবাদ। সদগুণ নীতিশাস্ত্র অর্থনৈতিক এজেন্টদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের বিকাশের গুরুত্বের উপর জোর দেবে, তাদের লেনদেনে সততা ও ন্যায্যতার সাথে কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

দার্শনিক চিন্তাধারার উপর অর্থনীতির প্রভাব :

অর্থনীতি ও দর্শনের সম্পর্ক একতরফা নয়। দর্শন যেমন অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি অর্থনৈতিক বাস্তবতাও দার্শনিক চিন্তাকে রূপ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, পুঁজিবাদের উত্থান স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং সুন্দর জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক বিতর্ককে উৎসাহিত করেছে। কার্ল মার্ক্সের পুঁজিবাদের সমালোচনা হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে দার্শনিক প্রতিফলনকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তার একটি প্রধান উদাহরণ। মার্কস যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিদের তাদের শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে, যা একটি অমানবিক অস্তিত্বের দিকে পরিচালিত করে। তার ধারণা অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শন উভয়ের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

একইভাবে, অর্থনীতির অধ্যয়ন মূল্যের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ঐতিহ্যগত অর্থনীতি প্রায়শই মূল্যের সাথে মূল্যকে সমান করে, কিন্তু দার্শনিকরা দীর্ঘ বিতর্ক করেছেন যে এটি মূল্যের একটি পর্যাপ্ত পরিমাপ কিনা। "অভ্যন্তরীণ মূল্য" ধারণাটি প্রস্তাব করে যে কিছু জিনিস মূল্যবান এবং নিজেদের মধ্যে মূল্যবান, তাদের অর্থনৈতিক মূল্য নির্বিশেষে, আর্থিক মূল্যের উপর অর্থনৈতিক ফোকাসকে চ্যালেঞ্জ করে। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনীতিবিদদের তাদের বিশ্লেষণে পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানব মর্যাদার মতো অ-অর্থনৈতিক মূল্যবোধগুলি বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে অর্থনীতি এবং দর্শনের অধ্যয়ন গভীরভাবে জড়িত। দর্শন নৈতিক এবং ধারণাগত কাঠামো প্রদান করে যা অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং নীতিগুলিকে আন্ডারপিন করে, যখন অর্থনৈতিক বাস্তবতাগুলি দার্শনিক চিন্তাকে আকার দেয়। উভয় শৃঙ্খলা একসাথে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে, ব্যক্তিরা বিশ্বের আরও বিস্তৃত উপলব্ধি অর্জন করতে পারে, এটি স্বীকার করে যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি কেবল প্রযুক্তিগত গণনা নয় বরং নৈতিক পছন্দও। একটি ক্রমবর্ধমান জটিল এবং আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে, অর্থনীতি এবং দর্শনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আগের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, একটি আরও ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজের দিকে আমাদের গাইড করে।

কেন পড়ব সংস্কৃত....?

ড. দেবলীনা ঘোষ

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ

প্রথমে জানতে হবে সংস্কৃত কী? ভাষা, সাহিত্য না সংস্কৃতি। যদিও ভাষা ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক কিন্তু প্রশ্ন আসে, সংস্কৃতর সঙ্গে সংস্কৃতি কথাটির কতটা মিল আছে। সংস্কৃত কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল সংযুক্ত করা, রচনা করা, ব্যবস্থাপনা করা ও প্রস্তুত করা। আবার সং শব্দের অর্থ সমরূপ এবং "স"-কার শব্দের অর্থ প্রস্তুত করা, তাহলে বলা যায়, যে ভাষা পাঠকগণকে পরিমার্জিত করে তাই সংস্কৃত ভাষা।

এবার আসা যাক "সংস্কৃত" কথাটির আক্ষরিক অর্থের ব্যাখ্যায়। পণ্ডিতগণের মতাবলম্বনে বলা যায় যে, "জীবনযাপনের পন্থা, বিশেষ করে নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্দিষ্ট একটি দলের মানুষদের সাধারণ প্রথা সমূহ ও বিশ্বাসগুলো।"

উপরোক্ত দুটো আলোচ্য শব্দকে একত্রিত করলে অর্থ হয়— যে ভাষা অভ্যাসের মাধ্যমে জনজীবনের জীবনাভ্যাস পরিমার্জিত হয় তাই হল সংস্কৃত সংস্কৃতি।

এখন মূল কথা হচ্ছে কেন আমরা সংস্কৃত পড়ব?..... এই প্রশ্নের উত্তরে আগে বলতে হবে "সংস্কৃত" একটি প্রাচীন ভাষা যা আমরা সর্বসাধারণ মনে করে থাকি। এই ভাষার মহিমা, গরিমা অপরিসীম।

সংস্কৃত অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যার মধ্যে ধর্মের ভূমিকা, আধুনিক ভাষার উপর সংস্কৃতির প্রভাব, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এই ভাষা।

সংস্কৃত হিন্দু ধর্মের পবিত্র ভাষা, এই ভাষা বৌদ্ধ, জৈন ধর্মেও ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অপরিহার্য এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র বা অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সংস্কৃত ভাষা জানা আবশ্যক।

সংস্কৃত অনেক আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে প্রভাবিত করেছে এবং এটি অনেক দক্ষিণ এশীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ভাষার মূলও। সংস্কৃত গ্রীক এবং ল্যাটিনেরা মতো প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষার মিল রয়েছে। তাই ইংরেজি, ফরাসি এবং অন্যান্য ভাষাকে প্রভাবিত করেছে।

সংস্কৃত ছিল প্রথম ভাষা যা শূন্যের ধারণা, দশমিক পদ্ধতি, পিথাগোরিয়াস উপপাদ্য এবং ত্রিকোণমিতি বর্ণনা করে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকদের জ্ঞানকে নথিভুক্ত করে।

সংস্কৃত তার পরিশীলিত ব্যাকরণ এবং বাক্য গঠনের জন্য পরিচিত, যার জ্ঞানের এবং ভাষার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

সংস্কৃত ভারতের প্রাচীন দর্শন, ধর্ম সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি সমৃদ্ধ তথ্যের উৎস বা খনি বলা যেতে পারে। তাই এই সবকিছু জানার জন্য সংস্কৃত পড়তে হবে।

মঙ্গলাচরণ

প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ

তৃতীয় সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ

নাটকের সকল বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্য নাটকের পূর্বে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে স্তুতিবাক্য পাঠ করা হয় তাকেই মঙ্গলাচরণ বলে।

√'নান্দি' ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করে হয় নন্দ। নন্দ শব্দের উত্তর 'প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ' সূত্রানুসারে স্বার্থে 'অন্' প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈপ্' প্রত্যয় করে নান্দী শব্দটি গঠিত। নান্দীর স্বরূপ বলা হচ্ছে। নান্দীতে নিজের অথবা পরের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য নটেরা দেবতা, ব্রাহ্মণ অথবা রাজগণের স্তুতিবাদ করে থাকেন। এই কারণে তার নামকরণ করা হয়েছে নান্দী। এই নান্দী মঙ্গলসূচক শঙ্খ, চন্দ্র, পদ্ম, চক্রবাক, কৈরব প্রভৃতি বস্তুদ্বারা মঙ্গলসূচনা করে থাকে। নান্দী শ্লোক ১২টি পদযুক্ত অথবা ৮টি পদ যুক্ত হবে।

নান্দীর সঙ্গে মঙ্গলাচরণের কিছু পার্থক্য আছে। নান্দী করবে কুশীলবেরা। মঙ্গলাচরণের আগেই নন্দী পাঠ করা হবে। অভিনয়ে নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য কুশীলব নান্দী পাঠ করে। কবি রঙ্গদ্বারে মঙ্গলাচরণ করেন তার নাটকটির পরিসমাপ্তির জন্য নান্দীর পরে এই মঙ্গলাচরণ করা হয়। মঙ্গলাচরণ যেহেতু রঙ্গদ্বার অংশে থাকে এবং রঙ্গদ্বার অংশ থেকেই নাটকের আরম্ভ হয়। সেই কারণে মঙ্গলাচরণ নাটকের অংশ। অথবা নান্দী রঙ্গদ্বারের পূর্বে হয় বলে নাটকে তা লিখিত থাকে না, বা নাটকের অংশও নয়।

"যা সৃষ্টির স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী

যে দ্বে কালং বিধিত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।

যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ

প্রত্যাক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।।"

অর্থাৎ যে মূর্তি স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার ও ব্যবহৃত পূর্বে বর্তমান ছিল যে মূর্তি শাস্ত্রবিধান অনুসারে প্রদত্ত হব্য বহন করে যে মূর্তি হুম সম্পাদন করে যে মূর্তি দয় সময় বিধান করে কর্নেল দিয়া রাজ্য গুনো যে মূর্তি সমস্ত বিশ্বজুড়ে রয়েছে সে মূর্তিকে সকল বীজের আধার বলা

হয়। এবং যে মূর্তির দ্বারা প্রাণী সকল বল সম্পন্ন হয়ে থাকে প্রত্যক্ষ অষ্টমুর্তিধর সেই শিব তোমাদের রক্ষা করুন

উপসংহার : উপরিউক্ত শ্লোকটি মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের প্রারম্ভে। সংস্কৃত সাহিত্য এইরকম ভাবে প্রতিটি কাব্য বা নাটকের সূচনাতেই একটি করে মঙ্গলাচরণ শ্লোক কবিরা লিখে নাটকের প্রারম্ভ করে থাকতেন। তাই বলা যায় মঙ্গলাচরণ শ্লোক সংস্কৃত সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা

তানিয়া দে

তৃতীয় সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ

বেদোত্তর প্রাচীন ভারতবর্ষের যে মূল্যবান কয়েকটি গ্রন্থ তার উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা লাভ করেছি সেগুলির মধ্যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এমন একখানি সৃষ্টি যার জন্য আমরা এখনও গর্ব অনুভব করতে পারি। প্রধানত রাজ্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় এই গ্রন্থটি খ্রিষ্টজন্মের পূর্ববর্তী সময়ে হলেও এখনো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিকতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির বিষয়বস্তু রাজ্য শাসনব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনা ও তত্ত্বনির্ণয় হলেও গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'অর্থশাস্ত্র'। গ্রন্থের পুঁথিতে রচয়িতা গ্রন্থটিকে অর্থশাস্ত্র নামেই উল্লেখ করেছেন।

কৌটিল্য তার গ্রন্থে হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণিত রাজ্য শাসনতন্ত্রে শাসন বিভাগগুলি বহু প্রকারের অধ্যক্ষ দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের মধ্যে গানণিক বা হিসাব রক্ষক অন্যতম।

দ্বিতীয় অধিকরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শাসনাধিকার। রাজাকে আদেশ বা বার্তা জ্ঞাপনের জন্য শাসন প্রেরণ করতে হয়। শাসন রাজাদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, কারণ সন্ধি ও বিগ্রহ শাসনের উপরেই নির্ভর করে। এই জন্য কৌটিল্য বলেছেন, যে ব্যক্তি অমাত্যের গুণ বিশিষ্ট, সর্বপ্রকার আচার বিষয়ে অভিজ্ঞ, পত্ররচনায় সিদ্ধহস্ত, উত্তম লেখক এবং দ্রুত পঠনে সক্ষম তাঁকে লেখক নিযুক্ত করতে হবে। এই প্রকার লেখক রাজাজ্ঞা শ্রবণ করে উত্তমরূপে বিষয় প্রণিধানপূর্বক রাজাদেশ লিপিবদ্ধ করবেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকারের শাসন হতে পারে। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের শাসন সম্বন্ধে বর্ণনা করে শাসন কিভাবে লিখিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন।

বিভিন্ন শ্রেণির অধ্যক্ষের দ্বারা শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগগুলি পরিচালিত হওয়ার যে চিত্র আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাই; তার সঙ্গে আধুনিক সরকারি শাসনব্যবস্থার আমলাতন্ত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় অধিকরণে একাদশ অধ্যায় থেকে চতুঃত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে বাইশজন অধ্যক্ষের বিশিষ্ট কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। এ অধ্যক্ষগণ যথাক্রমে—

১. কোষাধ্যক্ষ :-

কোষাধ্যক্ষের উপর রাজকোষ সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব থাকে। তিনি রাজকোষের জন্য আবশ্যক রত্ন এবং অধিক বা অল্পমূল্যের দ্রব্যাদি গ্রহণ করবেন। তাকে বিভিন্ন প্রকারের রত্ন এবং গন্ধদ্রব্যাদির বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে।

২. কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ :-

সীতাধ্যক্ষ দ্বারা কোষ্ঠাগারে প্রবেশিত কৃষিজাত সর্বপ্রকার শস্য কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ ঠিকমত ও অন্যূনভাবে গ্রহণ করবেন।

৩. পণ্যাধ্যক্ষ :-

পণ্যাধ্যক্ষ স্থলজ বা জলজাত পণ্য যে সকল পণ্য নদী বা স্থলপথে আনিত হয়েছে তাদের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করবেন। যে সমস্ত পণ্য অনেক দেশে পাওয়া যায় তা একস্থানে একত্রীভূত করে পণ্যাধ্যক্ষ তাদের মূল্যও বর্দ্ধিত করবেন।

৪. গোহধ্যক্ষ :-

রাজ্যের গোধনের রক্ষণ প্রতিপালন এবং গোদুগ্ধজাত ক্ষীরা মৃতাদির নিরুপণ গোহধ্যক্ষের প্রধান কাজ।

শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষগণের কার্যকলাপ বর্ণনা করবার পর সমার্হতা বা সর্বপ্রকার আয়ুস্থান থেকে রাজার অর্থের সম্যক আহরণকারী মহামাত্রের করণীয় কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কালিয়াগড় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের ইতিহাস সমগ্র

আরতি হেমব্রম

সাম্মানিক বাংলা, দ্বিতীয় সেমেস্টার

ভূমিকা :

আমাদের কলেজের "জাতীয় সেবা প্রকল্পে"র সংস্থার পরিচালিত একটি ক্যাম্প যেটি শুরু হয়েছে ২৯.০১.২০১৯ থেকে আজ তার চতুর্থ দিন। আজকের শিবিরে আমাদের সকল জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অতীত স্মারক পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে আমরা আজ ১.২.২০১৯ এ কলেজের আশেপাশে একটি বহু পুরনো মন্দির আছে 'কালিয়াগড় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির'। সেখানে গিয়ে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করি মন্দির সম্পর্কে সেটি নিচে লিপিবদ্ধ করা হল—

প্রথমে ওখানে গিয়ে আমাদের কলেজের অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় কিছু বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন যে, এই মন্দিরের সঙ্গে আমাদের বাংলা ভাষার হরফের কাহিনি যুক্ত আছে। বলা হয় যে, বাংলার হরফ আবিষ্কার করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। তিনি বসবাস করতেন চারাবাগান নামে একটি অঞ্চলে। কিন্তু সনাক্ত করা যায়নি সেই চারাবাগানটা ঠিক কোথায়, শোনা যায় যে মা একদিন গঙ্গায় স্নানের উদ্দেশ্যে যাবার সময় তাকে কিছু দস্যুরা তুলে নিয়ে যাচ্ছিল কর্মকাররা। তা দেখেও তাকে কোনো সাহায্য করেনি। তারপর মা তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তার বংশে বাতি দেবার মতো কেউ থাকবে না। তার কিছুদিন পর ম্যালেরিয়া ও কলেরায় সবাই মারা যায়। হয়তো তারাই একদিন মাকে অপহরণ করেছিল ও কর্মকারের পরিবার সাহায্য করেনি তারপর অলৌকিক হোক বা এমনি ১৭৬০-১৮০০ সময়কালে হুগলির পূর্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর ম্যালেরিয়া ও কলেরা হয়েছিল। ও এই অঞ্চলটাতে প্রচুর সেগুনের চারাগাছ ছিল তাই এই অঞ্চলের নাম হয় চারাবাগান। তিনি আমাদের এইটুকু অমূল্য জ্ঞান প্রদান করে তার বক্তব্য সমাপ্ত করলেন।

এরপর আমাদের সবাইকে আরো কিছু মূল্যবান ঐতিহাসিক জ্ঞান যিনি দিলেন তিনি হলেন আমাদের বিশেষ অতিথি শ্রী তপন দাস মহাশয়। তিনি আমাদের জানালেন যে, এই মন্দিরটি অর্থাৎ "কালিয়াগড় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির" আজ থেকে আনুমানিক ৯০০ বছর আগে হয়। শূর বংশের রাজা আদি শূর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এরপর কালের নিয়মে ১০০ বছর পর মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায় এরপর ঘটনার পরিবর্তন ঘটে। এবং ৫০০ বছর পর মুখার্জী পরিবারের

একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদিন জলে ঝাঁপ দেন এবং ভাসতে ভাসতে এই মন্দির প্রাঙ্গনে এসে পৌঁছায় এবং তিনি মায়ের স্বপ্নাদৃষ্ট হয় যে মা তাঁকে পূজা দিতে বলেছেন এবং তিনি চোখ খুলে দেখেন তাঁর সামনে পূজার সমস্ত উপকরণ সাজানো। এই গভীর জঙ্গলে কে পুজোর উপকরণ জোগাড় করবে! ব্রাহ্মণভাবে এসবই মায়ের লীলা প্রত্যক্ষ করলেন প্রতিদিন মন্দিরের নীচ থেকে প্রবাহিত গঙ্গা থেকে স্নান সেরে ব্রাহ্মণ একটি বেলগাছের তলায় মায়ের পূজারম্ভ করেন। এরপর তিনি সেখানে মাতৃপূজার বা মাতৃ আরাধনার অধিকার পান। তখন থেকে তার উপাধি হয় মুখার্জী থেকে অধিকারী। এরপর লোকমুখে ব্রাহ্মণের মাতৃ আরাধনা প্রচারিত হয়। এবং বাহ্মণের পরিবার ব্রাহ্মণকে খুঁজতে খুঁজতে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছায় এবং সেখানে ব্রাহ্মণকে দেখে চিনতে পারে এবং সেখানের বসবাস শুরু করে। এরপর এক বিরাট ভূমিকম্পে এই পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার মাতৃ আরাধনার দায়িত্ব নেন। তারাই বর্তমানে এখন মন্দিরে সেবাইত। এই ভাবে তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শেষ করেন।

আরও জানা যায় যে, বছরের দীপান্বিতা কালী পূজার দিন এই মন্দিরের বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই মায়ের সম্পত্তি বর্ধমানে গচ্ছিত আছে।

নাচ ও একটি সাধারণ মেয়ে

নিতিশা মন্ডল

বাংলা সাম্মানিক, চতুর্থ সেমেস্টার

নমস্কার। আমি নিতিশা। বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের ছাত্রী। 'ধূলিগন্ধা' পত্রিকার জন্য আজ লিখতে বসেছি আমার জীবনে নাচের ভূমিকা নিয়ে। প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি। আমি অমলা শংকর বা মমতা শংকর নই। বিখ্যাত কোনো নৃত্যশিল্পী নই। তবুও লিখছি, কারণ নাচ জিনিসটা শুধু বিখ্যাত মানুষদের জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। নাচ সবার। নাচ সর্বত্র। ঝড়ের তালে নেচে ওঠে গাছগাছালি। মেঘের গর্জনে নেচে ওঠে ময়ূর। অনন্ত মহাকাশে এক সুনির্দিষ্ট নৃত্য ছন্দে আবর্তিত হয় গ্রহ-নক্ষত্র। এই বিশ্বজগৎ এক মহানৃত্যশালা। আমরা প্রত্যেকেই কোনো এক অদৃশ্য নটরাজের অধীনস্থ নর্তক বা নর্তকী।

তখন আমার আট বছর বয়স। মূলত মায়ের আগ্রহেই আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হল নাচের স্কুলে। শিখতে শুরু করলাম রবীন্দ্র নৃত্য। তারও বছর খানেক বছর দেড়েক পরে যোগ হল লোকনৃত্য। বয়স তখন অল্প। কোনো কিছু শেখার জন্য শরীর ও মন তখন নরম মাটির মতো উপযুক্ত। আমার নৃত্যগুরুগণ আমাকে গড়ে পিঠে নিতে লাগলেন।

নাচ শেখাটা তখন ছিল খেলার মতো। নানা বয়সী ছেলেমেয়েদের একত্রিত হইহই। নানা সাজে সেজে ওঠা। নানান চরিত্র হয়ে ওঠা। কিন্তু সেই পর্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দূরে দূরে নাচের অনুষ্ঠানে যেতে হত বলে। এগারো বারো বছর বয়সে নাচ শেখায় ছেদ পড়ল। কিন্তু নাচ ব্যাপারটা অনেকটা সাঁতার শেখার মতো, জানেন? একবার যে সাঁতার শিখেছে, তার শরীরে সাঁতারের কলাকৌশল যেমন আজীবন রয়ে যায়, একবার যে নাচ শিখেছে তার শরীরেও রয়ে যায় নাচের বিভঙ্গ। তাই আমি ছাড়লেও নাচ আমাকে ছেড়ে গেল না।

আমার নৃত্য শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল আরেকটু বড় হয়ে। তখন ইলেভেনে পড়ি। আবার ভর্তি হলাম রবীন্দ্র নৃত্যের ক্লাসে। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত চলেছিল সেই তালিম। ছোটোবেলার নাচ শেখা আর বড় বেলার নাচ শেখার মধ্যে একটা পার্থক্য তখন বুঝতে শিখেছি। ছোটোবেলার নাচে আনন্দটাই ছিল মুখ্য। বড় বয়সে আনন্দ তো ছিলই, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হল নাচের খুঁটিনাটি ব্যাকরণের প্রতি মনোযোগ। গানের ভাব আর নাচের মুদ্রার মধ্যে সেতুবন্ধনের তত্ত্ব বুঝে নেওয়া। আমাদের ভাবনাগুলো আরও অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে

দেওয়ার জন্য ২০১৯ সালে আমি আর আমার পরিচিত এক দিদি এক নাচের দল খুলি। নাম দেওয়া হয় "নৃত্যোৎসাহী নৃত্যদল"। বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি আমরা ওই দলের মাধ্যমে।

নাচ আমার জীবনে কী? এক কথায় বলতে গেলে, মুক্তি মন খারাপ থেকে, একঘেয়েমি থেকে, ক্ষুদ্রতা থেকে। একটি সুন্দর নাচ একটি মৃত বিকেলকেও সোনালী আলোয় ভরে দিতে পারে।

নাচ আমাকে আরও একটি জিনিস শিখিয়েছে। মঞ্চ কোনো অজুহাত শোনে না। নাচের সময়টায় আমি নিতিশা নই। আমি "চিত্রাঙ্গদা", "শ্যামা", "চণ্ডালিকা"। ওই মুহূর্তে দেহে-মনে যতই ব্যথা আসুক, তা সরিয়ে রাখতে হবে। ওই যে, কথায় বলে না, "The show must go on!"

তখন মাধবিলতায় ফুল ফুটছিল

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

কাশের বনে যেন পেঁজা পেঁজা মেঘ ছড়িয়ে ছিল দিন ক' আগেও। বাবুদের বাড়ি দুগ্গা পুজোও হয়ে গেছে। ঝড়ে গেছে দুধ সাদা কাশের বনের ফুল।

দূরে একটা পাখি ডেকে ডেকে উঠছে — বউ কথা কও। বউ কথা কও। কাল রাত্তিরেই রুইতে চকের শংকর ঠাম্মার কোলে মাথা রেখে ভাত ঘুমের দুপ্পুর বেলা গপ্প শুনেছে। পাখিটা তখন ডাকছিল — বউ কথা কও....। বউ কথা কও। শংকর পাখিটার স্বর নকল করে দুটো ঠোঁট গোলাকৃতি করে প্রতিধ্বনি তুলছিল ব-উ-ক-থা-ক-ও। ব-উ ক-থা ক-ও।

ঠাম্মাকে শংকর শুধায় —

— ও ঠাম্মা পাখিটা এমন ডাকে ক্যানো গো। ওর বউ কি হাইরে গেছে?

— ধুর পাগল। বউ হাইরে যাবে ক্যান। ওই পাখিটাই তো বউ।

— পাখি তবে অমন ডাকে ক্যান?

এবার ঠাম্মা তালের পাখাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শংকরকে হাওয়া দেয়। অন্য হাতে শংকরের তেল চিটচিটে মাথায় আঙুল চালাতে চালাতে বলে -

— হল কি এক চাষির বাড়ি সাতটা ছেলে। তাদের আবার সাতটা বউ। আর ছেলেদের বেধবা মা। মা ভারি খানদানি। ভীষণ রাগ।

— রাগ! তোমার মতো?

— আমার মতো? দাঁড়া তোকে মার দিচ্ছি কেমন করে দ্যাখ! ঠাম্মা কান মুলে দেয় শংকরের। শংকর ঠাম্মার কান মলায় হেসে ওঠে খিক খিক করে।

শঙ্কর বলে – তারপর? তারপর কি হল?

— তারপর? তারপর একদিন ছোট বৌকে শাউড়ি বললো - শোন্ ছোট্ বৌ, আজকে রান্নার কাজ তুই করবি। আমরা মাটে যাচ্ছি। বাড়ি ফিরতে বিয়ান নামবে। খ্যাসরির ডাল আর ভাত

রেঁদে রাখবি। কটা বেগুন ভাত নামলে পুইড়ে নিস। পেঁইজ নঙ্কা নিয়ে একটুক তেল দিয়ে মেকে রাখিস। বৌ তো ঘাড় নাড়লো। ভাত চাইপে দিল। ভাত হলে ডাল চাইপে দিল। ডাইলে দিল নঙ্কা আর হলুদ। কিন্তুক কি আশ্চর্যি! এত্তটা হলুদ দিলুম ডাইলে রঙ হয় না ক্যানে! আবার হলুদ দে দিল ডালে। আবার হলুদ।

— শঙ্কর বলে এ মা, ডাইল তো তেতো হই যাবে।

— হ্যাঁ। তাই তো হল। কাজ থেক্কে সব্বাই ফিরলে। চানটান সেরে সার দিয়ে খেতে বসলে। কলাই করা সাদা থালায় ডাল আর ভাত, সাথে বেগুন ভত্তা সাইজে দিল।

— ওদের তেতো লাগলো নি ডাল?

— হ্যাঁ লাগলো তো। মুখে যেই দিল এ্যা রাম... এ রাম... এ্যা রাম ওয়াক থু। এ কি রেঁধেছিস ছোট বৌ। এ তেতো কি মুখে দেবার যোগ্যি!

— তারপর...

— তারপর ছোট্ বৌয়ের স্বোয়ামি কিল চড় মারলে বৌকে। শাউড়ি ভাতের হাড়ি দে বৌটার মাথায় মারলে। বউ তো মার খেতি খেতি মরেই গেল।

— আহা রে...।

— বৌটা মরে গিয়ে একটা পাখি হল। ওই যে ডাল রেঁইধেছিল, তার সবটা হলুদ পাখিটার গায়ে। মাতাটা হল কালো। ওই হাড়ি দে মারলো না? সেই হাড়ির কাঠের জ্বালের কালো রঙ নিয়ে তৈয়ার হল পাকির মাথা। তারপর থেকে পাখিটা দোপ্পুর হলেই দুয়ারে দুয়ারে যায় আর ডাকে বৌ কতা কও। বউ কতা কও।

এই সব সাতপাঁচ ভাবছিল শংকর। হাতের লাট্টুটায় ছেত্তি জড়িয়ে ঘোরাতে চাইছিল আনমনে।

এমন সময় ওই দূরে একটা গাড়ি দেখতে পেল শংকর। রুইতেচক, মদনিচক গ্রামে মাঝে মধ্যেই পুলিশের গাড়ি ঢোকে। শংকরের সন্দেহ হল। তাদের তেঁতুল তলার মাঠে আজকেই বিয়ানে তো মিটিং হবে। সেখানে গান হবে। হেই সা মালো ধান হো কাস্তেটা দাও শান হো...। ওই দেবতার মতন ফর্সা টুকটুকে মানুষটা কত সুন্দর কতা বলবে। বাপ কাকারা চুপ করে শুনবে। দেবতার মতন মানুষটাকে শংকরের ভারি ভালো লাগে। তাদের বাড়িতে যেদিন দুকুর বেলা খেতে এইছিলেন, শংকরকে এই একমুঠ্ঠ বাদাম দিইছিলেন। আজ তো লক্ষ্মী ঠাইরণের বাড়িতে এইছেন। পুলিশ কি তবে ওনাকেই ধরে নিয়ে যাবে।

শংকর ছুটতে শুরু করলো। ছুট... ছুট.... ছুট। মুখে বলছে পুলিশ... পুলিশ.. পুলিশ ... পু... লি... শ...

শংকরের গলার স্বর হাওয়া ভাঙতে ভাঙতে এক কান থেকে দুকান, দুকান থেকে দশ কান..

গ্রামের মেয়েরা শাঁখে ফুঁ দিতে শুরু করেছে। এক থেকে দশ, দশ থেকে বিশ, বিশ থেকে চল্লিশ, চল্লিশ থেকে আশি। শাঁখের আওয়াজে মুখরিত চারিদিক। ভগবান কৃষ্ণ যেমন তাঁর পাঞ্চজন্যে ফুঁ দিয়েছিলেন যুদ্ধের সময়। এই শঙ্খ যেন বাংলার মেয়েদের যুদ্ধের সতর্ক বার্তা। সারি সারি মেয়ে বউ পথে নেমে এলেন। ব্যারিকেড গড়তে গড়তে রুইতেচক, মদনিচকের মেয়েরা তৈরি করে ফেলল দীর্ঘ পাঁচিল।

পুলিশের গাড়ি ঢুকতেই পারলো না গ্রামে। শংকর হাঁপাতে হাঁপাতে লক্ষ্মী ঠাকরণের দাওয়ায়। দেবতার মতন মানুষটা তখন সবে এক গরস ফেনা ভাত মুখে দিয়েছেন। শংকর এসে তার দেবতার মতন মানুষকে বললো—

— পাইলে যান কত্তা, পাইলে যান। পুলিশ আইসতিছে...

তকখুনি খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। লক্ষ্মী ঠাকরণ বললেন, গোয়ালের মাচায় উঠে যান কত্তা।

যেতে যেতে ধুতি পাঞ্জাবি পরা দেবতার মতন সুন্দর মানুষটা শংকরের মাথায় হাত রাখলেন। শংকরের মুখ নিচু। মানুষটি বলে উঠলেন - মাথাটা উঁচু করো। আমার চোখে চোখ রাখ। শংকর, এই বছর চারেকের ছেলেটা আনমনে তাই করলে - দেবতার মতন মানুষটা বলে ওঠেন - সাব্বাস কমরেড। রাত্তির কাটতে আর বেশি দেরি নেই।

শংকর কিছু বোঝে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মানুষটা মুহূর্তের ভেতর গোয়ালের মাচায় উঠে যান।

শংকর শুনতে পায় তখনও শাঁখ বাজছে। টালমাটাল পায়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় শংকর। পথে ইস্কুলের মাস্টারের সঙ্গে দেখা। মাস্টারকে শংকর শুধায়— মাস্টার ওই দেবতার মতন মানুষটা আমায় বললেন, 'কমরেড'। 'কমরেড' মানে কি মাস্টার?

মাস্টারমশাই বললেন, কমরেড মানে বন্ধু। আর তোকে এই কথা কে বললে -

— ওই যে দেবতার মতন দেখতি মানুষটা তেঁতুল তলায় বক্তিমে দেন, উনি।

— ও। উনি বলেছেন। উনি কে জানিস?

— না তো। শুধু জানি দেবতার মতন মানুষ।

— হ্যাঁ ঠিক। দেবতাই তো বটে। তবে সগ্গের নন। আমাদের এই মাটির পৃথিবীর দেবতা। আমাদের যারা খারাপ করছে, আমাদের ওপর যারা অত্যাচার করছে, উনি এসেছেন সেই খারাপ লোকগুলোর হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে। ওঁর নাম কি জানিস?

— না তো। জানি না।

— ওর নাম বিজয় মোদক। উনি আমার আর তোর, সব্বার বন্ধু। উনি আমাদের কমরেড। বুঝলি?

— শংকর আনমনে বললো হুম।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে শংকর ভাবছে গতকাল ঠাকমা যে বৌ কথা কও পাখিটার গপ্প করছিলো সেই বউটার যদি একজন কমরেড থাকতো। এই দেবতার মতন দেখতে মানুষটার মতন কমরেড...।

ততক্ষণে শাঁখের আওয়াজ থেমে গেছে। বিকেল গড়িয়ে আসছে। তেঁতুলতলায় লোক জড়ো হচ্ছে। দেবতার মতন মানুষটা বলছেন - কমরেড, এই ১৯৪৮-এ আমরা স্বাধীন দেশেও না খেতে পেয়ে মরছি। জমিদার আর জোতদারেরা আমাদের প্রাপ্য মজুরি থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন। আমাদের আর একা একা বাঁচার সময় নেই। আমাদের এক হয়ে লড়বার দিন এসে গেছে...

শংকর এই সমস্ত কথা শুনছিল। কিছু বুঝতে পারছিল, বেশিরভাগটাই বুঝছে না। কেবল দেখছে এক একটা মিছিল আসছে আর হাতের মুঠো ওপরে দিকে তুলে বলছে — ''ইনকিলাব জিন্দাবাদ"।

গ্রামের মাধবীলতার ঝাড় থেকে তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে বুনো জঙ্গলের গন্ধ ভেদ করে। শংকর ঘাড়টা উঁচু করে সেই গন্ধ নেয়। মিটিং শেষে সমবেত ধ্বনি শংকরের কানে বাজতে থাকে

— "ইনকিলাব জিন্দাবাদ"।

'অদ্ভুত যাত্রী গাড়ি!'

অমিত দে

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, রসায়ন বিভাগ

বিগত তিন বছর বেকারত্বের জ্বালা অনুভূত হবার পর, ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের উদয় হল। হ্যাঁ, ঠিক তাই, বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকের চাকরি পেলাম। সরকারি চাকরি, কাল বাদ পরশু সোমবার স্কুলে যোগদান করতে হবে। স্কুলটা আমার বন্ধু অভিজিতের দিদির বাড়ির কাছেই। ঠিক করা হল আগামীকাল বিকেলে রওনা হয়ে অভিজিতের দিদি বাড়িতে রাত্রিতে থেকে পরের দিন সকালেই স্কুলে যাব। অভিজিত আমার সঙ্গেই যাবে। গ্রামের এক পরিচিত শিক্ষকের কাছে সমস্ত প্রারম্ভিক ক্রিয়াকলাপ জেনে নিয়ে, নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে শুরু করলাম। যেমনটি ভাবা হয়েছিল, সে রকম ভাবেই আগানো হল।

আমাদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর অভিজিৎ এবং আমি বাস ধরে আরামবাগে নামলাম। সেখান থেকে রিকশা করে গৌরহাটি মোড় গেলাম। বন্দরের একটি বাস পেলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব। গৌরহাটি মোড়ে গিয়ে দেখলাম অনেক মানুষই এখানে বন্দরের বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। আজকে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সভা থাকার জন্য অনেক বাসই তুলে নেওয়া হয়েছে, তাই বাসের সংখ্যা খুবই কম। শুনলাম এর আগের বাস দু'ঘণ্টা আগে চলে গেছে। এদিকে সন্ধ্যা হচ্ছে, অল্প অল্প খিদেও পাচ্ছে। অভিজিতকে বললাম, তুই এখানে দাঁড়া, আমি এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে আনতে যাচ্ছি। বিস্কুট কিনে পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, বন্দর যাবার একটা বড় বাস এসে দাঁড়িয়েছে। আশেপাশের প্রচুর লোকজন বাসে ওঠার জন্য ভিড় করেছে। আমিও ছুটে গিয়ে তাদের পিছনে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে বাসের কন্ডাক্টার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জানিয়ে দিল, আজকের জন্য এটাই শেষ বাস। অভিজিৎ আমার একটু আগেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বললাম- তুই যে কোনো ভাবে বাসে ওঠ, আমার চিন্তা করিস না, আমি উঠে যাব। আস্তে আস্তে বাস ভর্তি হয়ে গেল, অভিজিৎ বাসের ভেতরে উঠতে পারল, ৬ জন দরজার সামনে ঝুলতে আরম্ভ করল। দরজায় ঝুলে ঝুলে যেতে আমার বেশ ভয় হল। অজানা রাস্তা যদি খারাপ হয়, চলন্ত বাস থেকে মাটিতে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। তাছাড়া এখন বর্ষাকাল, আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো বৃষ্টি নামবে, তখন আমাকে ভিজে ভিজেই যেতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে একটু খেয়াল করলাম, বাসে তো দুটো দরজা! মানুষ একটা দরজা দিয়ে উঠছে কেন? আমি যদি পিছনে দরজাটা দিয়ে উঠে ভিতরে চলে যায় তাহলে বেশ ভালই হবে! যেই ভাবা সেই কাজ। ছুটে গিয়ে পিছনে দরজায়

হাতলটাকে নিচের দিকে নামিয়ে দরজাটাকে সজোরে টান দিতেই ক্যাচ শব্দ করে দরজা খুলে গেল। তৎক্ষণাৎ আমি বাসের মধ্যে উঠে গেলাম ও দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ভেতরে উঠে আমি একটু তাজ্জব হয়ে গেলাম। প্রথমত, বাসের পিছনে দরজা দিয়ে উঠে সামনের দিকে যাবার কোন সুযোগ নেই। দুটি দরজায় দুটি আলাদা কক্ষ, একটির সঙ্গে অপরটির কোন জানালা দ্বারাও যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। তারকেশ্বর থেকে হাওড়া যাবার লোকাল ট্রেনে ঢেউ দেখেছিলাম, প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্ট আলাদা আলাদা, ভিতর দিয়ে একটি থেকে অপরটিতে যাওয়া যায় না। বাসের মধ্যেও যে এইরকম হবে, সেটা কোনদিনই ভেবে উঠতে পারছিলাম না।

দ্বিতীয়ত, এই কক্ষে মিটমিট করে একটি আলো জ্বলছে। তাতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চারজন জরাজীর্ণ মানুষ শায়িত অবস্থায় রয়েছে। এই কক্ষ ঠিক যেন অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির মতোই। এই পরিস্থিতি দেখে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এখানেই থাকবো না নেমে গিয়ে সামনে ঝুলতে ঝুলতে যাবো? ভাবতে না ভাবতেই বাস চলতে আরম্ভ করল! মনের মধ্যে একটা চাপা ভয়ও কাজ করছে! বাসটি একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল, বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে গিয়েছি, দরজা খোলার আগেই বাস ছেড়ে দিল, আর নামা হল না। এইরকম ভাবে খানিকটা যাবার পর প্রচন্ড বেগে বৃষ্টি নামল, তার সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রপাত। ভয়টা হঠাৎ করেই কেটে গেল, ভাবলাম সামনে গেলে নির্ঘাত ভিজতাম, তার থেকেই ভালো এখানে যাচ্ছি। তাছাড়াও রাস্তাও খারাপ আর বাসটাও খুব লাফাচ্ছে। পুরানো দিনের বাস, চলতে চলতে অদ্ভুত শব্দ করছে। এই কক্ষটি অতটা বড় নয় মাত্র একটি জানালা ও একটি দরজা আছে। এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপার কোচের মতো বাসের ডানদিকে জানালার পাশে একটি নিচে ও অপরটি তার ওপরে এই রকম দুটি বেড। পিছনে জানালা নেই, ওপর ও নিচে - দুটি বেড। পিছনের বেডের সামনে একটি চেয়ার ও একটি টেবিল মেঝের সাথে সাঁটানো। চারজন লোকের গায়ে সাদা কাপড় ঢাকা দেয়া, মুখে ঢাকা নেই, তাদের নরম চরণ আমি এখন পর্যন্ত লক্ষ করিনি। জানালা ও দরজার দিয়ে জলের ঝাপটা ভিতরে আসছে, তাতেই একজন রোগীর গায়ে ও অল্পস্বল্প আমারও গায়ে এসে জল পড়ছে। টেবিলের ওপর আমার ব্যাগ রেখে দরজার কাঁচটা তুলে দেওয়ার সময় বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেখলাম, ওই দিকের গেটের চারজন ভিজে বকের মত দরজায় ঝুলছে। আমি দরজার কাঁচটা তুলে দিয়ে ভিতরে ওই দিকে জানালার কাঁচটা তুলে দিলাম। তখনই জানলার কাছে শুয়ে থাকা রোগীটি শুকনো গলায় আমাকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু আমার স্যালাইনটা চালু করে দিন। দুদিন ধরে গা হাত পা শুকিয়ে আসছে। দুর্বল হয়ে পড়ছি।'

নিশ্চিন্ত হলাম যে এরা প্রত্যেকেই রোগী কিন্তু অবাক হলাম, এই চারজন রোগীর সঙ্গে একজন ডাক্তার থাকা দরকার ছিল। এরা আমাকেই আবার ডাক্তার ভাবছে না তো? হয়তো একজন

ডাক্তার ওঠার কথা ছিল তার বদলে আমি উঠেছি। কিন্তু নিজেকে ডাক্তার ভাবতে অবাক লাগছিল। Zoology তে মাস্টার্স করার সময় এবং তারপরেও অনেক NEET এর স্টুডেন্ট পড়িয়েছি, নিজে ডাক্তার হওয়ার কথা কোনদিনই ভাবিনি। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই একটু লাজুক স্বভাবের হওয়ায়, ভাবতাম কোন মহিলা যদি রোগী হয়, তার রোগের কথা আমি কি বা জিজ্ঞেস করব এবং তার কি চিকিৎসা করব! সেটা নিয়ে সন্দেহ লাগতো। যাইহোক, ছোটবেলার কথা ভাবতেই, ক্লাস ফাইভের কথা মনে পড়ে গেল, 'Aim in Life' রচনা লিখতে হয়েছিল। আমি ইংরেজি গ্রামার বই থেকে টেনে মুখস্ত করে পরীক্ষায় লিখে দিয়েছিলাম এবং পরে ভালো নম্বরও পেয়েছিলাম। ইংরেজি অত ভালো বুঝতাম না, তবুও তার দু-একটা লাইন আমার এখনো মনে আছে, যার বাংলা মানে ' আমি ভবিষ্যতে ডাক্তার হব এবং বিনা পয়সায় গরিব মানুষের চিকিৎসা করব।' ভগবান হয়তো সেই কারণেই আমাকে চিকিৎসা করতে পাঠিয়েছে। আমার তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না, সে গরিব না বড়লোক, গরিব হলে আমি তার চিকিৎসা করব, বড়লোক হলে কিছু করব না! তাছাড়াও এখানে কোন মহিলা রোগী ছিল না। আমি ভাবলাম, মানুষকে উপকার করা মানুষের ধর্ম, এই অসময়ে আমি যদি এদের কোন সাহায্য করতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব। বাড়িতে ডাক্তারি হ্যান্ডবুকে যা পড়েছি, পড়াশোনার সময় ফিজিওলজি বিষয়ে যা শিখেছি এবং ছ-মাস প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করে যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি- তাই নিয়েই যতটুকু পারব সাহায্য করার চেষ্টা করব। টেবিলের ড্রয়ারে আধখোলা অবস্থাতেই দেখেছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নানা ধরনের ওষুধ, টেবিলের নিচে স্যালাইনের বোতল, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদি মজুত আছে। একটু নড়াচাড়া করতেই দেখলাম প্রথম রোগীটির হাতে চ্যানেল করা রয়েছে, আমি স্যালাইনের বোতল আর পাইপ বের করতে করতে রোগীটিকে বলতে বললাম আপনার কি হয়েছিল সংক্ষেপে বলুন। সে বলল , 'আমার নাম শেখ সেলিম, আমি বন্দরের গ্রামে দিনমজুরের কাজ করি। জমিতে ধান চাষের কাজ করতে গিয়ে গোখরো সাপে কামড়ায়, তারপর বন্দর হাসপাতালে ভর্তি হয়, সেখান থেকে আমাকে আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আরামবাগে খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় বন্দর হসপিটালে নিয়ে আসা হবে।' আমি বললাম, 'এই অদ্ভুত ধরনের বাসটির সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন? উত্তর দিল, 'কিছু বছর আগে পর্যন্ত বন্দর হাসপাতালের অবস্থা এতোটা উন্নত ছিল না। তাই রোগীদের এই ঘরেতে নিয়ে যাওয়া হত। তার পরিবার পরিজনের কেউ না কেউ থাকতো পাশের ওই ঘরটিতে। দুটি হসপিটালের ডাক্তারদের যাতায়াতের জন্য এই গাড়িটি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বন্দর হাসপাতালে অনেকটাই উন্নত হয়, সেই রকমভাবে রোগীকে আর আরামবাগে পাঠানোর দরকার হয় না। ডাক্তাররা প্রত্যেকেই নিজস্ব গাড়ি করে যাতায়াত করে। খুব জরুরি ভিত্তিতে রোগীকে তার পরিবার-পরিজন অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে আরামবাগ হাসপাতালে নিয়ে চলে আসে।

তাই এই বাসটির কদর আর আগের মত নেই। বাসটি আগে খুব কম পয়সায় ভালো পরিষেবা দিত। বর্তমান কালে কেউ আর এই বাস সহজে ব্যবহার করে না। তাই মালিকপক্ষের সিদ্ধান্তে সাধারণ যাত্রীদের আরামবাগ ও বন্দরের বিভিন্ন স্টপেজে পরিবহন করে। রোগীরা খুব কম পরিমাণে যায়, তাতেও সাধারণ মানুষ এই বাস সহজে ব্যবহার করতে চায় না।' এই কথা শেষ হবার আগেই আমি সেলাইনের বোতল উপরে আটকে দিয়েছি। পাইপ দিয়ে তার হাতের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অল্প করে চালিয়ে দিয়েছি। দেখলাম তার হাত-পা, মুখে কেমন যেন নীল নীল ছোপ ফুটে উঠেছে, সাপের বিষের জন্য হতে পারে। ইতিমধ্যে তার উপরের রোগীটি নড়েছে। বললেন, ডাক্তারবাবু! মনে মনে ভাবলাম,ডাক্তার শব্দটি আমার সঙ্গে মানাচ্ছে না। তবুও ওর যা শুরু করেছে! 'গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল'-এর যদি কোনো বিপরীত বাগধারা থাকলে সেটি আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার কি হয়েছে বলুন? উত্তর দিল, 'আমার নাম রবিন দাস, আমার টাইফয়েড জ্বর হয়েছিল, বন্দর থেকে আরামবাগে পাঠানো হয়েছিল, এখন খানিকটা সুস্থ। এখন আমার মনে হচ্ছে জ্বর আসছে, তাই জ্বর কমার কিছু একটা ওষুধ দিন।' খুঁজে খুঁজে প্যারাসিটামল বার করা হলো, কিছু খাবার পরে প্যারাসিটামল খাওয়া উচিত, তাই ব্যাগ থেকে বিস্কুটের প্যাকেটটি বের করে তাকে চারখানা বিস্কুট দিলাম। জল গাড়িতেই ছিল, জলের বোতল দিলাম এবং ওষুধ দিলাম, সে খেয়ে যথারীতি শুয়ে গেল। তৃতীয় রোগীটার সেরকম কিছু সমস্যা হয়নি, দেখলাম উঠে বসতেই তার মুখ থেকে লাল ঝরছে। তবু তার নাম জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল নবাব আলী, তার নাকি কুকুরে কামড়ানোর পর জলাতঙ্ক রোগ হয়েছিল। চতুর্থ রোগীটি উঠে বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমি বললাম- ভয় পাবেন না, আপনার কি হয়েছে বলুন। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমার অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং প্রচন্ড শীত লাগছে।' শীতের কথা বলতেই আমারও মনে হলো, হালকা হালকা শীত করছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে। গরম চা খেলে ভালো হতো। মনে পড়ে গেল থার্মোফ্লাক্সে চা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি চা খান'। চারজন একসাথে উত্তর দিল - হ্যাঁ/খাব। আজকের দিনে চা খায় না এমন লোক পাওয়া দুরহ, এই আবহাওয়া সকল চা প্রেমিদের চায়ের দিকে টেনে আনে।প্রথমে বিস্কুটের প্যাকেটটা থেকে সবাইকে দুটো করে বিস্কুট দেয়া হলো, হাত ধুয়ে আমিও চারটে বিস্কুট খেলাম। তারপরে আমি ব্যাগ থেকে কাগজের চায়ের কাপ ও থার্মোফ্লাক্সটা বের করে চারজনকে চা দিলাম। চেয়ারে বসে থার্মোফ্লাক্সটার ঢাকনাটাতে আমার চা ঢাললাম। দেখলাম সবার চা শেষ, ওরা আবার চায়ছে। বললাম আমি এই বসলাম, চা খায়, তারপর উঠব। তাড়াতাড়ি চা খেতে গিয়ে জিভ পুড়ে গেল, খুব ভালো কোম্পানির থার্মোফ্লাক্স ছিল,তাই চা যথেষ্টই গরম। কিন্তু ওরা এত সহজেই কি করে চা খেলো, যদিও আমি খুবই গরম চা খেতে পারি, তাছাড়া জলাতঙ্ক রুগি নির্বিঘ্নেই চা খেয়ে নিল- সত্যিই নেশা কি জিনিস! চা খেতে অনেকক্ষন ওদের সাথে গল্প গুজব হল। ওরা

এখানকার আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দা, ওরা নিজস্ব পরিবার নিয়ে কেউ সুখী নয়। ওদেরকে সেই কাপেই আবার চা দেওয়া হল। চা শেষ হলে অক্সিজেন সিলিন্ডারের গ্যাস চালু করে চতুর্থ রোগীদের মুখে মাক্স আটকে দিলাম। প্রথম রোগীর সেলাইন শেষ, নতুন আরেকটি দিয়ে অল্প করে চালিয়ে দিলাম। সেই মুহূর্তে বাস থেমেছে, জানালার কাচ নামিয়ে দেখলাম, বৃষ্টি থেমেছে, এটা একটা স্টপেজ, দরজা দিকে এগিয়ে দরজার কাঁচ নামিয়ে কন্ডাক্টারকে দেখতে পেলাম। বললাম বন্দর মোড়ে নামব, উনি বললেন- "আর ৫ মিনিট লাগবে, আগের দরজায় চলে আসুন, এদিকে বাস খালি হয়ে গেছে।" আমি উত্তর দিলাম "এতক্ষণ এখানে থাকতে পারলাম, আর মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যাপার,অসুবিধা নেই, স্টপেজ আসলেই আমাকে জানাবেন'" বাস আবার চলতে আরম্ভ করল। অল্প হাত ধুয়ে, চেয়ারে বসে, দুটি বিস্কুট আর চা খেলাম। তারপরই লক্ষ করলাম প্রথম রোগীর সেলাইন আবার শেষের পথে, ফ্লাক্সের ঢাকনা আটকাতে আটকাতে উঠে গেলাম, দেখলাম ঠিকই চলছে, যেমন আস্তে চালিয়ে ছিলাম। কিন্তু চারভাগের তিনভাগ এত তাড়াতাড়ি টেনে শেষ করল কিভাবে? থার্মোফ্লাক্সটা রোগীর মাথা কাছে রেখে, পাইপলাইনটা ঠিক আছে নাকি দেখে নিলাম, কোন অসুবিধা নেই। তারপরেই হঠাৎ দেখি জলাতঙ্কের রোগীটি আমার দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে আছে, এদিকে সে নাক ডাকতে ডাকতে ঘুমাচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষ যে ঘুমাতে পারে! সেটা প্রথমবার দেখলাম। চোখগুলো হাতে করে বুজিয়ে দিলেই আবার খুলে যায়, তার দৃষ্টি অন্যদিকে চলে যায়, চোখের মণি যেন চোখ বন্ধ করলেই এদিক ওদিক ঘুরছে। তার শরীর অস্বাভাবিক ঠান্ডা। হঠাৎ বাসটি জোরে ব্রেক দেওয়ায়, তার ঠান্ডা হাতটি আমার ঘাড়ে এসে পড়ল, আমি ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে বসে পড়লাম। বাসের অল্প আলোতে দেখলাম, তার একটি হাত আমার দিকে বাড়ানো, অপলক দৃষ্টি আমাকেই দেখছে। ভয়ে ভয়ে ভাবলাম এরা জীবিত না মৃত! সেই সাথে দরজা হঠাৎ খুলে কন্ডাক্টর ডাক দিল, "বন্দর মোড় চলে এসেছে, নেমে আসুন।" ব্যাগটি টেবিল থেকে টেনে নিয়ে, উঠেই আমি পড়ি মরি করে নিচে নেমে আসলাম, সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে, লোড শেডিং, আশেপাশে কোনো দোকান খোলা নেই। জানালা দিয়ে বাসের সামান্য আলোই দেখলাম কন্ডাক্টর বললেন, "এই বে-ওয়ারিশ লাশের সাথে অত দূর রাস্তা এলেন, আপনার দারুণ সাহস আছে মানতে হয়।" আমি ভয়ে থতমত খেয়ে বললাম, মানে! মরা! লাশশশ! উনি আরও বললেন, "বন্দর হাসপাতালে লাশগুলোকে পোস্টমর্টেম করার জন্য আনা হচ্ছে, এত বার লাশ আনা হয়েছে, আমি ভুলেও এদের সঙ্গে আসার কথা ভাবতে পারিনি। আমাকে তাড়াতাড়ি বাস ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দিন।" আমার শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে, জোর করে শক্তি সঞ্চয় করে, মানি ব্যাগ থেকে একশো টাকার নোট দিয়ে বললাম গৌরহাটি মোড় থেকে দু-জন। গলা দিয়েও যেন আওয়াজ বের হচ্ছে না। উনি জানালেন এখানে আর কেউ নামেননি, আমি একাই। আমি যেন

আকাশ থেকে পরলাম, তাহলে অভিজিৎ কোথায় গেল? উদ্বিগ্নভাবে অভিজিতের বর্ণনা দিতেই বললেন "উনি হয়তো আপনাকে দেখতে না পেয়ে, গৌরহাটি মোড়ের সামান্য পরেই গেছেন।" "দাদা দশ টাকা কম নিলাম-' বলেই ফেরত টাকা বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েই বাসে চড়ে ও বাস ছেড়ে চলে যায়। আমিও জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে থাকলাম। অবচেতন মনে ভাবতে থাকলাম, গৌরহাটি মোড়ে বাস ছাড়ার পর যখন থেমেছিল, তখন যদি নেমে পরতাম, তাহলেই অভিজিতের সাথে দেখা হয়ে যেতো। বাড়ি থেকে একটি টর্চ নিয়েছিলাম, সেটিও আবার ওর ব্যাগে। এখানকার লোকজন, রাস্ত-ঘাট কিছুই আমি জানি না। জনমানবহীন এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ওর দিদির বাড়ি পৌঁছাবো! এখানে বাস থেকে যদি না নেমে যদি বন্দর বাসস্ট্যান্ড বা হসপিটালের কাছে চলে যেতাম, তাহলে রাতে থাকা ও খাবার কিছু না কিছু ব্যাবস্থা হয়ে যেতো। কিন্তু বাসটাও অনেক দূর চলে গেছে, অমি চাইলেও আর ধরতে পারব না। কথায় আছে না- চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আজকের দিনটাই খারাপ, নিজের প্রতি খুব রাগ আর বিরক্ত লাগল। বাসটির দিকে আমি এখনও তাকিয়ে, একটি আলোর স্রোত আমার থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। অপর একটি হলো— বজ্রপাতের আলো, যা কয়েক মুহূর্তে জন্য চারিদিকে আলোকিত করে, নিমেষের মধ্যে আরও গভীর অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। বাসটির সামনে একটি বড়ো বাম্পার থাকায়, বাসটি আস্তে হয়ে একবার নেচে উঠল। অনেক দূর থেকে জানালা দিয়ে পরা ক্ষীণ আলোয় দেখতে পেলাম, একটি মানুষ বাস থেকে নেমেছে। বাস আবার চলতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর বজ্রপাতের ঝলকানিতে দেখলাম, সে আমার দিকেই আসছে। ভাবলাম ও কি অভিজিৎ হতে পারে! বর্ষাকালের ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল! সেই ভেবেই খুশি মনে আমিও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আবার এক দুশ্চিন্তা আমাকে থামিয়ে দিল। অভিজিতের ব্যাগে যে টর্চ আছে, সেটা ও নিজেও জানে, ও যদি অভিজিৎ হতো, নিশ্চয়ই আলো জ্বেলে আসতো। এটিও মিথ্যা আশা। আর না এগিয়ে, অন্ধকার ভেদ করে আসা মানুষটিকে দেখার চেষ্টা করলাম। এক ঝলকে দেখলাম, সে দুটি হাত উপরে তুলে দিয়ে আসছে- সাধারণ মানুষ কেউ এইভাবে হাঁটে! মনে পড়ল, বয়েজ হাইস্কুলে যখন পড়াশোনা করতাম, পড়া না পারলে একজন শিক্ষক দুই হাত ওপরে তুলে, জিভ বের করে, বাবা কালী বানিয়ে সারা ক্লাস ঘোরাতেন। ওর আবার কিসের শাস্তি! আরও কিছুটা পরে, সে যখন আমার কাছে চলে আসছে, বিদ্যুতের এক তীব্র ঝলকানিতে দেখলাম সাপের কামড়ে মরা লাশটি ডানহাতে খালি সেলাইনের বোতল তুলে ধরে, আর বামহাতটি উপরে তুলে আমার থার্মোফ্লাক্সটি নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, আমি ভুলে এটা ওর মাথার কাছে রেখে চলে এসেছিলাম, কিন্তু ওই লাশের কাছ থেকে এটি কি ফেরত নিতে পারব! খুবই ভয় পেলাম, কি জানি আবার কি হতে চলেছে, এই লাশের ভূতগুলোকে জীবিত মানুষ ভাবাই আমার অপরাধ হয়েছে। অল্প

দূর থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ দিল, " ডাক্তারবাবু, আপনার থার্মোফ্লাক্সটি ফেরত নিয়ে যান।" কোথা থেকে জানিনা একটি কালো কুকুর তার পিছন থেকে পরিত্রাহী ডাক ছাড়তে ছাড়তে, প্রচন্ড চিৎকার করে ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ভয়ে পিছন দিকে ঘুরে সজোরে ছুটতে আরম্ভ করলাম, তারাও আমার পিছু নিলো। কোনো লোকজন নেই, অন্ধকার, রাস্তার প্রচুর গর্ত, তাতে আবার বৃষ্টির জল জমে- তাতেই আমি প্রাণপনে দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছি, একটাই ভয় পিছন থেকে এসে যদি ধরে... ছুটতে ছুটতে গর্তে পা পিছলে মুখথুবড়ি খেয়ে পড়লাম, আ...আ...আ... করে চিৎকার করে উঠলাম। কাদা জলে আমার মাথা ও জামা কাপড় ভিজে গেল। ....ঘুম ভেঙ্গে দেখি, সকাল হয়েছে, আমি বিছানা থেকে পড়ে গেছি, বিছানার নিচে জলের মগ উল্টে মেঝেতে ছড়িয়ে গেছে, তাতেই আমি খানিকটা ভিজে গেছি, হাত ও কোমরে ব্যথা লেগেছে, আমি যেন এখনও হাঁপাচ্ছি! গামছায় গা হাত পা মুছে, অভিজিতকে ফোন করলাম, তুই ন-টায় আমাদের বাড়ি চলে আয়, এখানে ভাত খেয়ে দশ-টার বাসে বের হব, বিকালে বের হতে আমার একটু সমস্যা রয়েছে। ওর কলেজ রবিবার থাকায়, এক কথায় রাজি হয়ে গেলো।

পরে মনে মনে ভাবলাম, স্বপ্নটা হয়তো অতটা ভয়ানক ছিল না, যদিও তার প্রভাব এখন পর্যন্তও যায়নি, শরীরের যন্ত্রণাগুলো কবে যাবে কে জানে! একটা কথা চিন্তা করে দেখলাম, দিনের জীবিত মানুষ না রাতের মৃত লাশের আত্মা- কোনটি বেশি ভয়ঙ্কর! ভূতদের সাহায্য করেছিলাম বলেই, সে আমার উপকারই করতে চেয়েছিল, আর দৈনন্দিন জীবনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সাধারণ জীবিত মানুষেরা যেটা করে.....! সত্যিই কি অদ্ভুত!

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বলাকা হালদার

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ

পৃথিবীর আছে যত বীর

উচ্চে তুলি শির

গেয়ে গেছ মানবতা আর স্বাধীনতার জয় গান।

তুমিও তাদেরই দলে,

যদিও বীরক্ষেত্রে পৃথক,

চোখে চোখ রেখে শাসকের নিজ অধিকার বুঝে নিতে শিখিয়েছো তুমি।

অংক, বিজ্ঞান, আইন অবাধ যাতায়াত

প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার

বিদ্যাসাগরের হাত থেকে একখানা বই পেয়ে

আশি হাজার বই দিয়েছ জাতীয় গ্রন্থাগারে

যেখানে যেখানে মেধার বিকাশ

বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ শিক্ষার ভার,

তুলে নিয়েছো আপন কাঁধে, উঁচু মাথায়।

তাইতো আপমর দেশের মানুষ তোমায় স্যালুট জানায়,

বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

নিষ্ঠুর নিয়তি

সীমা বৈরাগী

বাংলা সাম্মানিক, দ্বিতীয় সেমেস্টার

ওহে, মায়াশূন্য পাষাণ হৃদয়, দিগন্তের ক্লান্ত সূর্য

হরণ করে নিচ্ছ কেন প্রকৃতির ঐশ্বর্য?

ক্ষণিক আলো দেখাও ভালো, জগৎকে কেন করো কালো, এমন শিক্ষা কোথায় পেলে বলতে পারো? বলো?

নিষ্ঠুর তুমি, জানি না আমি, সাজালে কখন সন্ধ্যা পরিবেশ,

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দিবসের কাজ করতে পারিনি শেষ।

সৃষ্টির সব প্রকৃতি সাজাও

পুরুষ তুমি সাজো।

নারীর অলংকার কেড়ে নিলে, কেমন হয় তা বোঝো?

পুরুষ হয়ে জানো না তুমি,

মায়া-মমতার খেলা,

দিন শেষে না হতে আমার

ঘনাও সন্ধ্যাবেলা!

মনে রবে?

প্রিয়াঙ্কা সরকার

বাংলা সাম্মানিক, চতুর্থ সেমেস্টার

একদিন ডাক এল। ভর্তির চিঠিওয়ালা খাম।

ইস্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে এলাম।

অচেনা কলেজ-বাড়ি, বড় গাছ, বড়-বড় ঘর।

মোটা বই, গোটা বই, ক্লাসরুম মৌন-মুখর।

অচেনা সঙ্গী সাথী, শূন্য থেকে ফের সব শুরু।

মুখ গুরুগম্ভীর, বুক দুরুদুরু।

তারপর... ধীরে ধীরে... ভোরের কুয়াশা যায় কেটে। কারণ পেরিয়ে আমি আনন্দপুরীতে ঢুকি হেঁটে। হেঁটে কোথা! ধড়ে চলি, পিঠে যেন লাল-নীল পাখা।

শীতের নরম রোদে কলেজের মাঠে বসে থাকা। গরম চায়ের কাপে আর একটা ক্লাস ডুবে যায়।

"দেখিস সামলে নেব, পরীক্ষার আগের সন্ধ্যায়"।

ঝলমলে দিন কাটে, হাসি-খুশি আড়ি আর ভাবে।

মোটা বই - গোটা বই - আর ভয় লাগে না সেভাবে।

তিনটি বছর শেষে - আবারও ভর্তির সেই খাম।

হে কলেজ, মনে রবে, মুখচোরা মেয়েটির নাম?

ACADEMIC FACULTIES

1. Dr. Pratap Banerjee Principal

DEPARTMENT OF COMMERCE

2. Prof. Sukumar Dan Associate Professor
3. Dr. Subham Dastidar Assistant Professor
4. Prof. Mrinal Kanti Roy State Aided College Teacher
5. Prof. Arnab Ghosh State Aided College Teacher
6. Prof. Sujit Dutta State Aided College Teacher
7. Prof. Paromita Banerjee State Aided College Teacher

Department of English

8. Dr. Abhijit Ghosh Assistant Professor
9. Prof. Soma Biswas Assistant Professor
10. Prof. Amrita Chakraborty State Aided College Teacher
11. Prof. Dibyendu Bhattacharya State Aided College Teacher
12. Prof. Balaka Halder State Aided College Teacher

Department of Mathematics

13. Dr. Biswajit Paul Assistant Professor
14. Prof. Sanjukta Das State Aided College Teacher
15. Prof. Papiya Ghosh State Aided College Teacher
16. Prof. Tapa Manna State Aided College Teacher

Department of Physical Education

17. Prof. Amitab Kumar Mondal State Aided College Teacher
18. Prof. Priyatosh Mondal State Aided College Teacher

Department of Education

19. Prof. Prayosi Adak State Aided College Teacher

20. Prof. Manik Biswas State Aided College Teacher

Department of Philosophy

21. Prof. Mousumi Saha State Aided College Teacher

22. Prof. Subhendu Mondal State Aided College Teacher

Department of Chemistry

23. Dr. Namrata Saha State Aided College Teacher

24. Prof. Rimpa Mondal State Aided College Teacher

25. Prof. Amit kumar De State Aided College Teacher

26. Prof. Somshuddha Marik State Aided College Teacher

27. Prof. Paromita Halder State Aided College Teacher

Department of Sanskrit

28. Dr. Debalina Ghosh State Aided College Teacher

29. Prof. Sangita Mondal State Aided College Teacher

30. Prof. Maloy Ghosh State Aided College Teacher

31. Prof. Manidipa Modak State Aided College Teacher

Department of Physics

32. Prof. Uday Ghosh State Aided College Teacher

Department of Economics

33. Prof. Dilip Kumar Chatterjee Associate Professor

34. Prof. Kalachand Sain State Aided College Teacher

Department of Bengali

35. Dr. Asima Halder Assistant Professor

36. Prof. Partha Chattopadhyay State Aided College Teacher

37. Dr. Susmita Das State Aided College Teacher

Department of Geography

38. Prof. Debapriya Ghosh State Aided College Teacher

39. Prof. Subhasis Biswas State Aided College Teacher

40. Prof. Raju Dutta State Aided College Teacher

Department of Political Science

41. Prof. Dalia Hossain Associate Professor

42. Prof. Hasina khatun State Aided College Teacher

43. Prof. Kheyali Debnath State Aided College Teacher

44. Prof. Soma Sarkar State Aided College Teacher

Department of History

45. Prof. Akbar Hossain Associate Professor

46. Prof. Biswajit Munda Assistant Professor

47. Prof. Bani Chatterjee State Aided College Teacher

48. Prof. Piu Banerjee State Aided College Teacher

49. Prof. Saifudden SK. State Aided College Teacher

50. Prof. Mitali Ghosh State Aided College Teacher

Non Teaching Staff

1. Mr Ajay Bhar - Cashier

2. Mrs Anjali Pramanik - Lady Attendant

3. Mr. Narayan Mandal

4. Mr. Suman Chatterjee

5. Mr. Partha Mukhopadhyay

6. Mrs. Mina Ghosh (Dam)

7. Mr. Supratim Ghosh

8. Mr. Prashanta Mondal

9. Mr. Suman Nath

10. Mr. Goutam Mondal

Governing Body: 2021-2022	
President of the Governing Body	Shri Shantanu Banerjee
Principal & Secretary of the G.B.	Dr. Pratap Banerjee
State Govt. Nominee	1. Biren Biswas
	2. Vacant
Nominee of West Bengal Council of Higher Education	Prof. Subrata Rana Assistant Prof. of English Education Khalisani Mahavidyalaya
University Nominee	1. Dr. Basudeb Halder Associate Prof. of Geography Sarat Centenary College
	2. Dr. Shrabanti Banerjee Associate Professor of Chemistry RRR Mahavidyalaya
Teachers' Representative	1. Prof. Sukumar Dan Associate Professor of Commerce
	2. Vacant
	3. Vacant
Non-Teaching Representative	